অটোমেটিক জীবন ও সমাজ

বিনয় ঘোষ

কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

প্রকাশক : অমল গুপ্ত অয়ন ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর : রবীন্দ্রনাথ দাশ মুদ্রাকর প্রেস
১০/১সি, মারহাট্টা ডিচ্ লেন কলকাতা ৭০০০০৩

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

প্রবন্ধসংকলন প্রসঙ্গে

গত পনের-কুড়ি-পঁচিশ বছরে বিভিন্ন পত্রিকায় নানাবিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। উৎসাহী পাঠকরা বহুদিন ধরে বলেছেন এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে সংকলন করতে। কেবল যে অবসরের অভাবে তা করতে পারিনি তা নয়। অধিকাংশ প্রবন্ধের কোনো কপি (মুদ্রিত) আমার কাছে ছিল না। কবে কোন্ পত্রিকায় কোন্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাও পুরো মনে ছিল না। প্রসঙ্গত বলছি, লেখার ব্যাপারে আমি এমনিতে যথাসম্ভব শৃঙ্খলানুবর্তী হলেও, লেখা শেষ হবার পরে, বিশেষ করে প্রকাশিত হবার পরে, গ্রন্থাকারেই হোক অথবা কোনো পত্রিকায় প্রবন্ধাকারেই হোক, আমার সমস্ত উৎসাহ উবে যায়, এমনকি লেখার প্রতি মমতা পর্যন্ত। তার জন্য আমার নিজের কাছে আমার লেখা অধিকাংশ বইয়ের কপি নেই, প্রবন্ধের তো নেই-ই। পুরনো বই পুনর্মুদ্রণের সময় আমাকে নিজের বই পাঠাগার বা কোনো পাঠকের কাছ থেকে ধার করে এনে কাজ করতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধসংকলনের ব্যাপারে তার চাইতেও বেশি ঝঞ্ঝাট করতে হয়েছে। কারণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ কোনো পাঠাগারে সংকলিত থাকে না, কোনো পাঠকের কাছেও তা থাকা সম্ভব নয়। পাঠাগারিক কয়েকজন পাঠকবন্ধু, গবেষকের মতো, পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে প্রবন্ধগুলি সংকলন করে দিয়েছেন, তাই এগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

এযাবৎ যা প্রবন্ধ লিখেছি ও প্রকাশিত হয়েছে, তার বেশকিছু এখনও খোঁজ পাওয়া বা করা সম্ভব হয়নি। যা পাওয়া গিয়েছে সেগুলি এরকম দু'তিনটি বা আরও বেশি খণ্ডে সংকলিত হতে পারে বলে মনে হয়। পনের-কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার লেখা প্রবন্ধগুলির মধ্যে আমার বর্তমান (১৯৭৮) চিন্তাধারায় কিছু

স্ববিরোধী অসঙ্গতি পাঠকদের কাছে ধরা পড়বে। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও চিন্তার অন্তর্লীন সঙ্গতির একটা সূত্র তাঁরা হয়ত এগুলির মধ্যে খুঁজে পাবেন। তা ছাড়া লেখক হিসেবে আমার চিন্তাধারার বিকাশের আঁকাবাঁকা পথরেখার যদি আদৌ কোনো মূল্য পাঠকদের কাছে থাকে, তাহলে এই প্রবন্ধসংকলন তাঁদের কাজে লাগতে পারে। রচনাগুলি আনন্দবাজার পত্রিকা (শারদীয়), দেশ, দৈনিক বসুমতী (শারদীয়), যুগান্তর (শারদীয়), পরিচয়, শনিবারের চিঠি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, উত্তরসূরী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'অয়ন'-এর অনুজপ্রতিম তরুণ প্রকাশকদের প্রচুর উৎসাহ না থাকলে এই প্রবন্ধসংকলন প্রকাশ করা সম্ভব হত কি-না সন্দেহ।

বিনয় ঘোষ

সেপ্টেম্বর ১৯৭৮

অটোমেটিক জীবন ও সমাজ

প্রবন্ধ সংকলন / ১

বাঙালী সদাগরশ্রেণী

বাঙালী সদাগরশ্রেণী ইতিহাসের এক বিচিত্র রহস্য ও প্রহেলিকা হয়ে রয়েছেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা একথা অস্বীকার করতে পারেন না। অর্থনীতি ও সমাজনীতির ছাত্রদের উচিত এই প্রহেলিকার সমাধান করা। কিন্তু সমাধান আপাত-দৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয়, আসলে তত সহজ নয়। যে-কোনো কঠিন 'ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌লের' চেয়েও কঠিনতর এই বাঙালী সদাগরদের 'পাজ্‌ল।' সাহিত্যের ছাত্ররা জানেন, বাংলাসাহিত্যের কতটা অংশ জুড়ে বাঙালী সদাগরশ্রেণী বিরাজ করছেন। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান নায়ক বাঙালী সদাগর। লোক-সাহিত্যেও সদাগরদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। প্রশ্ন বা প্রহেলিকা এই : যে বাংলার সমাজ-জীবনে বাঙালী সদাগরদের এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সেই বাঙালী সদাগরশ্রেণী পরবর্তীকালে পুঁজিপতি বা শিল্পপতিশ্রেণীতে পরিণত হতে পারলেন না কেন? যে বিরাট মূলধন তাঁরা বংশানুক্রমিক ব্যবসায়ের ফলে সঞ্চয় করেছিলেন, সেই মূলধন কোন্ রন্ধ্র দিয়ে কোথায় উবে গেল এবং কেন গেল? কেন তাঁরা পুঁজিবাদী যুগে প্রধানত দালাল ও দোকানদারের স্তরে নেমে এলেন? বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা অনুশীলন করলে এই ধরনের অনেক প্রশ্ন মনে জাগে, যার সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এইজন্যই বাঙালী সদাগরশ্রেণীর ইতিহাসকে প্রহেলিকা বলেছি।

পশ্চিমবাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে এ-প্রশ্ন আমার মনে সম্প্রতি বিশেষভাবে জেগেছে। বাংলার সদাগর সমাজের অতীত ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে রয়েছে ভাগীরথীর পশ্চিমে রাঢ়দেশে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যে নেই তা নয়, কিন্তু বর্তমান বর্ধমান ও হুগলী-হাওড়া জেলায় যেরকম আছে, সেরকম আর কোথাও নেই। বণিকপ্রধান এমন বহুগ্রাম এ-সব অঞ্চলে এখনও আছে যার অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতি দেখলে আজও অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে বাঙালী সদাগরশ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রহেলিকা ভেদ করতে পারলে কেবল যে একটা সামাজিক সমস্যারই সমাধান হবে তা নয়, বাংলার একটা অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রহেলিকারও সমাধান হবে। অর্থাৎ বাংলার সদাগরী প্রহেলিকা কেবল সামাজিক প্রহেলিকা নয়, সাংস্কৃতিক প্রহেলিকাও। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ে বাঙালী সদাগরশ্রেণী যে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, বাংলার মঙ্গলকাব্যে ও লোকসাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। বাংলার কোন্ অঞ্চলে সদাগরশ্রেণীর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় জানতে পারলে, বাংলার চণ্ডীপূজা, মনসাপূজা ও শিবপূজার আদিকেন্দ্রের, অথবা প্রাধান্যকেন্দ্রের আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই কারণে সদাগরশ্রেণীর প্রহেলিকাকে সাংস্কৃতিক প্রহেলিকাও বলা যায়।

বাঙালী সদাগরশ্রেণীর প্রাচীনতা

বাঙালী সদাগরশ্রেণীর প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করতে হয়। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু যতটা সম্ভব সংক্ষেপে এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব। বাংলার সদাগরদের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বাংলাদেশের আর্যীকরণের (Aryanisation) ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি যেসব বিভিন্ন বণিকজাতি নিয়ে বাঙালী সদাগরশ্রেণী গঠিত তাঁরা কেউ প্রাগার্য জাতির আধুনিক বংশধর নন্। নৃতাত্ত্বিক মানদণ্ডে তাঁদের দৈহিক গড়নের বিচার করলে অন্তত তাই মনে হয়। দেড়হাজার দু'হাজার বছরের ইতিহাসে সব জাতির মধ্যেই যেমন মিলন-মিশ্রণ হয়েছে, বণিকজাতির মধ্যেও তেমনি হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের কাছে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীর কোনদেশেই নেই, আমাদের দেশেও নেই। বিশুদ্ধ জাতিস্বাতন্ত্র্যের 'সংস্কার'

অশিক্ষা ও কুশিক্ষাজনিত কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। আমাদের দেশের লোকের অস্থিমজ্জায় আজও এই কুসংস্কার আছে। বর্ণাশ্রমপন্থীরা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এমন এক জাতি-নিউরসিসের সৃষ্টি করেছেন আমাদের দেশে, যা উপড়ে ফেলতে অনেক সময় লাগবে বলে মনে হয়। সে যাই হোক, আমাদের দেশের বণিকদের কথা বলি।

প্রাচীন ইতিহাসে বণিকদের কথা বৈদিক যুগ থেকেই পাওয়া যায়। প্রাক্-বৈদিক যুগেও সমাজে বণিকশ্রেণী ছিল বলে মনে হয়। অন্তত সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন থেকে বোঝা যায় যে ব্যবসায়ী শ্রেণী তখনও ছিল। বৈদিক যুগেও ছিল। বৈদিক সাহিত্যে বণিকদের বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে। বৌদ্ধযুগেও সে বণিক-শ্রেণীর বেশ প্রতিপত্তি ছিল, বৌদ্ধ-সাহিত্যের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে বাংলা দেশের বণিকশ্রেণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বৈদিক যুগের বণিক বাংলা দেশ পর্যন্ত এসেছিলেন কি না তা বলা যায় না। আসতেও পারেন, নাও আসতে পারেন, এলেও আসে যায় না কিছু। কারণ, এসে তাঁরা বাংলা দেশে যে বসবাস করতেন, তা মনে হয় না। আমাদের প্রশ্ন হল, বাংলা দেশে বণিকরা কবে থেকে নিয়মিতভাবে আনাগোনা ও বসবাস করতে আরম্ভ করলেন? কবে থেকে তাঁরা বাংলার গ্রাম্যসমাজে স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ও শ্রেণী হিসেবে নিজেদের স্থান করে নিলেন? নদীমাতৃক বাংলা দেশের আদিবাসিন্দাদের মধ্যে জলের ও স্থলের শিকারীরা এবং কৃষিজীবীরাই প্রধান ছিল। পশুপালকরাও ছিল। তাদের মধ্যে জিনিসপত্রের লেনদেন যে ছিল না তা নয়। কিন্তু সেই সব আদিম কৌমসমাজে বৃত্তি হিসেবে বাণিজ্যকে গ্রহণ করে যে স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল, তা মনে হয় না। আজও আমাদের দেশের সাঁওতাল বা অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে স্বতন্ত্র বণিকশ্রেণীর বিকাশ হয়নি দেখা যায়। উৎপাদকরা (Producer) নিজেরাই তাদের উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের লেনদেন করে হাটবাজারে। আদিম কৌমসমাজের এইটাই বিশেষত্ব। মধ্যবর্তী একটি বণিকশ্রেণীর বিকাশের সেখানে কোনো সুযোগ নেই। বাংলা দেশের আর্যপূর্ব সমাজেও ছিল না এবং বণিকশ্রেণীর স্বতন্ত্র বিকাশ তখন হয়নি। পূর্বভারতে ও বাংলা দেশে আর্যদের আগমনের সময় থেকে ধীরে ধীরে বণিকশ্রেণীর বিকাশ হতে থাকে।

পূর্বভারতে আর্যরা প্রথম আসেন বিদেহতে বা মিথিলায় (উত্তরবিহারে)।

মিথিলা থেকে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয় উত্তরবঙ্গে, মগধে বা দক্ষিণবিহারে এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষে বা আসামে। বাংলা দেশ যে মগধের নন্দ ও মৌর্য রাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়; খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত তাঁরা রাজত্ব করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকরা পাটলিপুত্রের এই রাজাদের প্রাচী ও গঙ্গারিড়ির (গঙ্গারাঢ়ের) রাজা বলেছেন। গঙ্গারিড়ি বা গঙ্গারাঢ়ের মধ্যে যে রাঢ়দেশ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মৌর্যযুগ থেকেই বাংলার আর্যীকরণ আরম্ভ হয় এ ং তখন থেকেই মনেহয় আর্যসমাজভুক্ত বণিকরা বাংলা দেশে নিয়মিতভাবে আনাগোনা ও বসবাস করতে শুরু করেন [১] প্রধানত নদ নদীর তীরেই তাঁরা বসতি স্থাপন করেন এবং ধীরে ধীরে বন্দর ও বাণিজ্য-নগর গড়ে তোলেন। যেসব বন্দর ও বাণিজ্যনগর তাঁরা গড়ে তোলেন তার মধ্যে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ।

গুপ্তযুগে বাংলা দেশের আর্যীকরণ আরও অনেক সম্পূর্ণ হয়। গুপ্তরাজারা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পশ্চিম থেকে নিয়ে এসে ভূমিদান করে বাংলা দেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বাংলা দেশেও এসেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় কাহিনীর মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়েরই ইঙ্গিত করেছেন। কালিদাসের 'রঘুবংশ' থেকে জানা যায় যে তখন বাংলা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের নৌবাহিনী বিখ্যাত ছিল। গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় যে ব্যাঙ্কার ও বণিকদের বিশেষ স্থান আছে। ভুক্তির শাসনকার্য চালাতেন উপরিক, নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাহায্যে।[২] এই প্রতিনিধিমণ্ডলী বা শাসন-পরিষদের নাম ছিল, 'অধিষ্ঠানা-ধিকরণ'। এই শাসন-পরিষদের সভ্যসংখ্যা ছিল চারজন—

নগরশ্রেষ্ঠী, অর্থাৎ ব্যাঙ্কার বা শেঠদের প্রতিনিধি
প্রথম সার্থবাহ, বা বণিকসমাজের প্রতিনিধি
প্রথম কুলিক, বা উৎপাদক-শিল্পীদের প্রতিনিধি
জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, বা রাষ্ট্র দফতরের চীফ সেক্রেটারি

চারজনের মধ্যে তিনজন সমাজের অর্থনৈতিক স্তরের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। তার মধ্যে একজন হলেন নগরশ্রেষ্ঠী বা ব্যাঙ্কার। শ্রেষ্ঠীর বা শেঠের প্রতিনিধিত্ব থেকে বোঝা যায় যে সমাজে ব্যাঙ্কিং বা মহাজনী কারবার বেশ রীতিমত চালু ছিল এবং শেঠদের বেশ প্রতিপত্তিও ছিল। অবশ্য প্রতিপত্তিটা অর্থনৈতিক

প্রতিপত্তি। প্রতিনিধিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী ছাড়াও 'প্রথম সার্থবাহ' বা বণিকসমাজের একজন প্রতিনিধি থাকতেন। শুধু ব্যাঙ্কার বা মহাজনের নয়, বণিকদের প্রতিনিধিরও বিশেষ স্থান ছিল শাসন পরিষদে। এর থেকে বণিকশ্রেণীর স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া উৎপাদকশিল্পীদের প্রতিনিধি থাকতেন। তাঁকে 'প্রথম কুলিক' বলা হয়। কৃষিপ্রধান সমাজে এরকম কৃষিবর্জিত পেশার তিনজন প্রতিনিধি শাসনপরিষদে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্ররা এর মধ্যে চিন্তা করবার অনেক খোরাক পাবেন। পণ্য-উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্পর্কে গুপ্তযুগের শাসকরা যে বিশেষ সজাগ ছিলেন, তা এই প্রতিনিধি নির্বাচন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। গুপ্তযুগে এই কারণে বাণিজ্যের বিস্তার হয়েছিল যথেষ্ট এবং বণিকশ্রেণীর প্রাধান্যও বেড়েছিল। বাংলার প্রাচীন বন্দরে বন্দরে এইসময় বেশ সুসমৃদ্ধ বাণিজ্যনগরও গড়ে উঠেছিল মনেহয়। এইসময়কার একটি বাণিজ্যনগরের কথা আমরা চীনা পর্যটকদের বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি, তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের কথা। তাম্রলিপ্তি প্রসঙ্গে চীনা পর্যটকরা বণিকদের কথাও উল্লেখ করেছেন। হুয়েন সাং তমলুকের লোকদের রীতিমত ধনী বলেছেন। 'কথাসরিৎসাগরেও' তমলুকের ধনী ব্যবসায়ীদের লঙ্কা ও সুবর্ণদ্বীপের সঙ্গে ব্যবসায়ের কথা আছে। তাম্রলিপ্তি থেকে সুবর্ণভূমির বাণিজ্যপথ ছিল সমুদ্রের উপর দিয়ে, আরাকান ও বর্মা হয়ে। এই পথে মালয় ও সুদূরপ্রাচ্য পর্যন্ত বাঙালী সদাগররা বাণিজ্যযাত্রা করতেন। দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে টলেমিও এই বাণিজ্যপথের কথা জানতেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে আসেন বাণিজ্যতরীতে এবং তাম্রলিপ্তি থেকেই সিংহল হয়ে চীনে ফিরে যান। সপ্তম শতাব্দীতে তমলুক থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত রীতিমত বাণিজ্যতরী যাতায়াত করত।[৩] দক্ষিণ-পূব ছাড়াও, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিজ্যের আরএকটি জলপথ ছিল তমলুক থেকে। কলিঙ্গ ও করোম্যাণ্ডাল উপকূল দিয়ে দক্ষিণভারত ও সিংহল পর্যন্ত এই পথে বাঙালী সদাগররা যাতায়াত করতেন। জাতকের গল্পে, পেরিপ্লাস গ্রন্থে, প্লিনির লেখায় এই পথের উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চীনা পর্যটক আইসিং তমলুক থেকে পশ্চিমদেশে বাণিজ্য যাত্রার স্থলপথের কথা উল্লেখ করে গেছেন। আইসিং বলেছেন যে তাম্রলিপ্তি থেকে স্থলপথে যখন তিনি বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন তখন শত শত বণিকও তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন।[৪]

এইসব প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, গুপ্তযুগে বাংলার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয় এবং বাঙালী সমাজে সদাগররা রীতিমত প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গুপ্তযুগের পর পালযুগে ও সেনযুগে বাণিজ্যের আরও দ্রুত ক্রমোন্নতি হয় এবং বণিকরাও রীতিমত প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হন। নদনদীর তীরে তীরে, তমলুক ছাড়াও আরও অনেক স্থানে, তাঁরা বন্দর ও বাণিজ্যনগর গড়ে তোলেন। মনেহয়, প্রধানত রাঢ়দেশের বা পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর তীরেই বাঙালী সদাগরদের বসতি ও পত্তনগুলি গড়ে ওঠে। দামোদর অজয় সরস্বতী ও ভাগীরথী, এই কয়টি প্রধান নদনদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার তীরেই বাঙালী বণিকদের প্রাচীন বসতি স্থাপিত হয়। এ অনুমান ঐতিহাসিক যুক্তিসহ, কারণ ভাগীরথীর পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম বণিকশ্রেণী বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আনাগোনা করতে থাকেন মগধ থেকে। ভাগীরথীর প্রবাহ তখন আরও পশ্চিম-দক্ষিণমুখী ছিল এবং ক্রমেই পুবদিকে এই প্রবাহ সরে গেছে। দামোদর অজয় ও সরস্বতীও তখন অনেক বড় ও বিস্তৃত নদনদী ছিল। বড বড বাণিজ্যতরী যাতায়াত করত এই নদীপথে। বর্তমানের খড়্গেশ্বরী, কানা নদী, কানা দামোদর ইত্যাদি তখন বেশ প্রশস্ত নদী দিল। দামোদরও পূর্ব থেকে ক্রমে পশ্চিমে সরে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে এইসব নদনদীর তীরে, বর্ধমান ও হাওড়া হুগলী জেলায়, যেরকম বণিকপ্রধান বসতির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, এরকম আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। অতীতের এইসব বণিকপ্রধান বসতির চিহ্ন দেখলে আজও বোঝা যায়, একসময় এইসব গ্রাম ও নগর বাঙালী সদাগরদের সম্পদে কিরকম সুসমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হয়েছিল। দামোদর ও অজয় নদের তীরে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, সরস্বতীর তীরে, কানা নদী, কানা দামোদর, খড়্গেশ্বরী বা খড়ি নদীর তীরে, বাঙালা বণিকদের সুসমৃদ্ধ বসতির যেরকম ধারাবাহিক স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়, এবং যা বাংলা দেশের আর কোনো অঞ্চলে এমনভাবে দেখা যায় না, তাতে মনেহয় বাঙালী সদাগরশ্রেণীর প্রথম স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশ প্রধানত পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলেই হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে ঘন ঘন বৈদেশিক অভিযান হয়েছে, হিন্দুযুগ থেকে মুসলমান ও খ্রীস্টান যুগ পর্যন্ত। তার ফলে যে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, অনেকসময় তা বাণিজ্যের অনুকূল নয় বলে সদাগররা পশ্চিম থেকে পূর্বতীরে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে চলে গেছেন। এছাড়া ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও

বৈপ্লবিক গতি-পরিবর্তন হয়েছে। তার ফলে নদীতীরবর্তী বণিকবসতি ও বাণিজ্য নগরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। বড় বড় ইমারৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ নিয়ে অসংখ্য জনশূন্য একদা-বণিকপ্রধান গ্রাম আজও পশ্চিমবঙ্গের নদনদীর তীরে তার নির্বাক সাক্ষীরূপে বিরাজ করছে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে বণিকদের কথা

হিন্দুযুগের পর মুসলমানযুগেও যে বাঙালী সদাগরদের সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, তার পরিচয় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যে ও চৈতন্য-সাহিত্যে পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী সদাগরশ্রেণীর সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লক্ষণীয়। বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যে চাঁদবেণের বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা আছে : [৫]

গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে
অনেক ছাগল করিয়া বলিদানে।
সনকারে প্রবোধ করিয়া নৃপবর
শুভক্ষণে বুহিত্র মেলিল নরেশ্বর।
দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্বজয়া
দু'লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া।
তৃতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে জগদ্দল
বারো বরিষের ধরে তণ্ডুল সম্বল।
চতুর্থ মেলিল ডিঙ্গা নাম সুমঙ্গল
যার রূপে দুই কুলে হইল উজ্জ্বল।
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে নবরত্ন
যার রূপ দেখিতে দেবের হয় যত্ন।
অষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে চিত্ররেখা
জার ধনে আদি অন্ত নাই লেখা জোখা।
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নামে শশিমুখী
বহুদূর হইতে যার ছইঘর দেখি।

বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবতে' সপ্তগ্রামের বণিকদের কথা আছে। নিত্যানন্দ বণিকদের ঘরে ঘরে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন।

সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তন বিহারে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভাবিলেন লইয়া শরণ॥

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানের কথা সকলেই জানেন। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন, কুটুম্ব সমাগম ও বণিকদের মধ্যে সম্মানপ্রাপ্তির জন্য বিবাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বণিকসমাজের প্রসার ও প্রতিপত্তির যে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর বললেও অত্যুক্তি হয় না। ধনপতিধামে প্রায় সাতশত বণিকেব সমাগম হয়েছিল, প্রধানত বর্ধমান হাওডা ও হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে।

একে একে বণিকের কত কব নাম।
সাতশত বেণে আইসে ধনপতিধাম॥

বণিকসভায় কে বেশি সম্মান পাবেন তাই নিয়ে যে বিবাদ আরম্ভ হয়, তাতে দেখা যায়

যেকালে বাপের কর্ম কৈল ধূসদত্ত।
তাহার সভায় বেণে হৈল ষোল শত॥

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে সাতশত বণিকেব সমাগম হয়েছিল এবং ধূসদত্তের পিতৃশ্রাদ্ধে ষোলশত বণিকের। সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বণিক এবং প্রধানত বর্ধমান ও হুগলী-হাওড়া জেলাতেই অধিকাংশের বাস।

মঙ্গলকাব্যে বাঙালী বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনসম্পদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিপ্রদাস বলেছেন যে চাঁদ সদাগরের সর্বজয়া ডিঙ্গাতে দু'লক্ষ টাকার পণ্য ভরা ছিল—'দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্বজয়া, দু'লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া।' সাতখানি ডিঙ্গার সাতরকমের নাম—নরেশ্বর, সর্বজয়া, জগদ্দল, সুমঙ্গল, নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশিমুখী। ডিঙ্গাগুলির ডিজাইন বা আকার কেমন ছিল জানা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মন্দিরের গায়ে কয়েকরকমের নৌকার চিত্র দেখা যায়—পোড়ামাটির ইটের উপর উৎকীর্ণ। বাংলার নদনদীতে এই ধরনের নৌকা যে চলাচল করত তাতে সন্দেহ নেই। সব নৌকাতেই যে পণ্যের পসরা যেত তা নয়, লোকলস্করও যেত সঙ্গে। চাঁদ সদাগরের সাতটি ডিঙ্গার মধ্যে একটিতেই যদি দু'লক্ষ টাকার জিনিস থাকে, তাহলে সাতটিতে মোট কত লক্ষ টাকার জিনিস ছিল তা

অনুমান করা কঠিন নয়। এত টাকা মূল্যের জিনিস নিয়ে কোনো সদাগরই একা সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা করতেন না। জলদস্যুর উৎপাত ছিল তখন যথেষ্ট। সঙ্গে ডিঙ্গারক্ষী নিয়েই তাঁরা বাণিজ্য-যাত্রা করতেন। বাণিজ্যের মুনাফা থেকে যে তাঁরা কি পরিমাণ ধন সঞ্চয় করেছিলেন তা চাঁদ সদাগরের পণ্যের বহর দেখেই বোঝা যায়।

ধনে মানে কুলে শীলে চাঁদ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা॥

—কবিকঙ্কণ

ধনপতির শ্বশুরও লক্ষপতি সদাগর ছিলেন

সাধুর শ্বশুর আইল নামে লক্ষপতি।
নানাধন লয়ে আইসে সাধুর বসতি॥

—কবিকঙ্কণ

ষোড়শ, সপ্তদশ, এমনকি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও দেখা যায়, বাঙালী সদাগররা বেশ প্রচুর পরিমাণে ধনসঞ্চয় করেছিলেন। প্রশ্ন হল, শত শত বৎসর ধরে বাণিজ্য করে বংশপরম্পরায় ধনসঞ্চয় করেছেন যেদেশের সদাগরশ্রেণী, সেদেশে ইংরেজ আমলের আগে পর্যন্ত কেন নতুন ধরনের পণ্যোৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত হল না, নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হল না, এবং ইংরেজ আমলেও কেন তাঁদের ভিতর থেকে আধুনিক যুগের পুঁজিপতির বিকাশ হল না বেশি। প্রশ্ন খুবই জটিল এবং উত্তরও সহজ নয়।

বাণিজ্যের সম্পদ ও জাতীয় প্রগতি

এ-প্রশ্নের উত্তর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে দেবার চেষ্টা করব। বরং কোন্ পথ ধরে অনুসন্ধান করলে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, তারই ইঙ্গিত করব বলা চলে। কারণ অর্থনীতির কিছুটা জটিল তত্ত্বকথা সবিস্তারে আলোচনা না করলে, এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে তার অবকাশ নেই বলে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করছি। বাণিজ্য প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা হল, বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ আর জাতীয় সম্পদ (National Wealth) এক নয়। কথাটা হেঁয়ালি মনে হবে, কিন্তু হেঁয়ালি নয়। দেশের মুষ্টিমেয় বণিকশ্রেণী বাণিজ্য করে যতই ধনসঞ্চয় করুন, তাতে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি হয় না। কেন হয় না? কারণ বণিকশ্রেণী নিজেরা

পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন না, উৎপন্ন পণ্য নিয়ে লেনদেন করেন, কেনাবেচা করেন। দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন পদ্ধতির (Mode of Production) পরিবর্তন প্রয়োজন, নতুন পদ্ধতিতে নানাবিধ পণ্যের উৎপাদন প্রয়োজন। শুধু ব্যবহার্য পণ্যের নয় (Consumption goods), উৎপাদনযন্ত্রেরও উদ্ভাবন প্রয়োজন। পুঁজিপতিরা (Capitalists) উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তন করে উৎপন্ন দ্রব্যের বৈচিত্র্য বাড়ান, বাজার প্রসারিত করেন। তাই পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদ বাড়ে। কিন্তু বণিকরা (Merchants) তা করেন না, বণিকবৃত্তির (Mercantilism) সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নেই। সংকীর্ণ অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাণিজ্যের বিস্তার হলে অনেকসময় দেখা যায় যে সেই সংকীর্ণতা আরও কায়েমী হয়। বাংলা দেশেও তাই হয়েছে। প্রাচীন সমাজে বাণিজ্যলব্ধ মূলধন বৃদ্ধির ফলে কিভাবে দাস ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, কার্ল মার্ক্স সেকথা উল্লেখ করেছেন। মার্ক্স বলেছেন **'In the antique world the effect of commerce and the development of merchant Capital always results in slave economy.'**[১] বাংলা দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন-পদ্ধতি প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিই ছিল, মৌর্য ও গুপ্তযুগ থেকে ব্রিটিশ যুগের গোড়া পর্যন্ত তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সংকীর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সেই সংকীর্ণতা আরও বেশি কায়েমী ও দৃঢ়মূল হয়েছে। বাঙালী সদাগররা বাংলার গ্রাম্যসমাজকে যতদূর সম্ভব সংঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত করে নিজেদের বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করেছেন। কোনো নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি তাঁরা উদ্ভাবন করেননি। তার ফলে মার্ক্স কথিত 'antique world'-এ যেমন বণিকের মূলধন বৃদ্ধির ফলে 'slave economy'-র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তেমনি বাংলা দেশেও ধনপতি সদাগরেরা 'আত্মনির্ভর গ্রাম্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে' বদ্ধমূল করেছিলেন। সেটা ভেঙে ফেলে নতুন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারেনি।

এই হল আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ হল, ধনসঞ্চয় (Saving) অর্থনৈতিক প্রগতির অনুকূল নয়। ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে সঞ্চয় করা হয় তার কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক মূল্য নেই। যা উৎপাদনের জন্য বা ভোগের জন্য নিয়োগ বা ব্যয় করা হয়, সেই সঞ্চয়ের সামাজিক

মূল্য আছে। আমাদের দেশে চিরকাল ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয়ের দিকেই মানুষের লক্ষ্য বেশি। তাই চাঁদ সদাগরদের 'সাত মরাই টাকাও' দেশের জাতীয় সম্পদ বাড়াতে পারেনি।

তৃতীয় কারণ হল, লেনদেনের মাধ্যম (Medium of Exchange) হিসেবে টাকাপয়সার বেশি প্রচলন ছিল না আমাদের দেশে। টাকাপয়সার অসম্ভব দুষ্প্রাপ্যতার (Scarcity) জন্য সুদের হার (Rate of Interest) ছিল অত্যন্ত বেশি। প্রাচীন হিন্দুযুগ থেকে ব্রিটিশযুগ পর্যন্ত যদি আমাদের দেশের 'সুদের হার' যাচাই করে দেখা যায় তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন রকমের সুদের হার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে[৮]। তাতে সুদের যে পরিমাণ হার দেখা যায় তা ভয়াবহ বললেও অন্যায় হয় না। সুদের এই উৎকট হার উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের দেশে টাকাপয়সার দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বজায় ছিল। তার জন্য মূলধন বিনিয়োগের বা উৎপাদনবৃদ্ধির কোনো প্রেরণাও উৎপাদক বা ব্যবসায়ীরা পাননি। বাণিজ্যের ফলে বাইরে থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকাপয়সা (সোনা) আমাদের দেশে আমদানি হলেও, আমাদের নগদ সোনা বা টাকা সঞ্চয়ের বাসনা চিরকাল এত বেশি যে তার ফলে সমাজে টাকাপয়সারও দুষ্প্রাপ্যতা কোনদিন কমেনি এবং সুদের হারও কমেনি। কীন্‌স ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই কথাটি অতি সুন্দরভাবে বলেছেন : [৯]

> The history of India at all times has provided an example of a country impoverished by a preference for liquidity amounting to so strong a passion that even an enormous and chronic influx of the precious metals has been insufficient to bring down the rate of interest to a level which was compatible with the growth of real wealth.

ভারতের ক্ষেত্রে যা সত্য, বাংলার ক্ষেত্রেও তা মিথ্যা নয়। বাংলার ধনপতি ও চাঁদ সদাগরেরা যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেও তাই ইংরেজ আমলের আগে নতুন কোনো যুগের প্রবর্তন করতে পারেননি। তাদের ব্যক্তিগত সঞ্চিত ধন অনেকসময় অযোগ্য বংশধরদের বিলাসিতায় উবে গেছে। ইংরেজ

আমলে তাঁরা ইংরেজ বণিক-শাসকদের কূটবুদ্ধিতে খুব সহজেই মধ্যবর্তী দালাল ও মধ্যশ্রেণীর দোকানদারে বা আড়তদারে পরিণত হয়েছেন। যাঁরা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, কলকারখানার দিকে নজর দেবার আগেই ইংরেজরা তাঁদের নতুন জমিদারী কিনিয়ে নব্যযুগের জমিদার করে দিয়েছেন। রঙ্গতামাসা ও বিলাসিতা করে আড়তদারি ও দালালির সঞ্চিত ধন তাঁরা ফুঁকে দিয়েছেন। তারপর দীর্ঘকাল ইংরেজ আমলে জমিদারী চালিয়ে বাঙালী বণিকদের জমিদারী প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। নতুন শিল্পোৎপাদনে মূলধন নিয়োগের দুঃসাহস বা সৎসাহস তাঁদের নেই। আজও সেকালের মহাজনী মনোভাব ও সুদের কারবার তাঁরা অনেকেই ছাড়তে পারেননি। আজও সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও বাঙালী ধনিকরা হাড়ে মজ্জায় ফিউডালযুগের ধনিক, বুর্জোয়াযুগের ধনিক নন। বাঙালীর জাতীয় অবনতির এও একটা অন্যতম প্রধান কারণ। মর্মান্তিক ও করুণ হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই।

১৯৫২

১ প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে এবং পরে মধ্য ও পূর্ববঙ্গে আর্যদের প্রভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে—'With the infiltration of Magadhan settlers, merchants, soldiers, officials and agriculturists, and Brahmanas, Sramanas and Yatis, to minister to the religious needs of the Brahmanists, Buddhists and Jains and also to bring within the fold of Aryan or Upper Indian religion and culture the non–Aryan tirbes of the land. (History of Bengal, Dacca University, Vol 1, p 373)

২ R. D. Banerjee: The Age of Imperial Guptas, Ch. p, II

৩ R. C. Mazumdar: Subarnadwipa: Vol I, p 7. Vol II, p 350

৪ Takakusu's I-tsing p. 31

৫ শ্রীসুকুমার সেন সম্পাদিত বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্য এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উদ্ধৃতি এই সংস্করণ থেকে নেওয়া।
Vipradasa's Manasa-Vijaya: Ed. by Dr. Sukumar Sen (Bibliotheca India Series) p. 142

৬ চৈতন্যভাগবত: অন্ত্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়

৭ Karl Marx: Capital, Vol III, p. 390
M. Dobb: Studies in the Development of Capitalism. Chaps 2 & 3

৮ P. V. Kane: History of Dharmasastra, Vol III, pp. 417-430

৯ J. M. Keynes: The General Theory of Employment, Chap 23, p. 337

মার্ক্‌সবাদ ও মর্গানবাদ

সম্প্রতি শ্রীডাঙ্গের *India—From Primitive Communism to Slavery* নামক গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় দুই সহস্রাধিক শব্দসম্বলিত এক 'গৌরচন্দ্রিকায়' মার্ক্‌সবাদ ও মর্গানবাদ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন।* ভূপেন্দ্রনাথ আমাদের দেশে একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ মার্ক্‌সবাদী পণ্ডিত হিসেবে সুপরিচিত। আমরা অনেকেই যখন ভূমিষ্ঠ হইনি তখন থেকে তিনি এদেশে মার্ক্‌সবাদের অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমাদের মধ্যে প্রগতিশীল ও মার্ক্‌সবাদী চিন্তাধারার তিনি একজন অন্যতম প্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। মার্ক্‌সবাদী রাজনীতি-ক্ষেত্রে শ্রীডাঙ্গের স্থানও অনেক উচ্চে, কয়েকজন সর্বভারতীয় কর্মীর মধ্যে তিনি একজন প্রবীণতম কর্মী। 'তত্ত্বানুশীলন' বা 'থিওরি' এবং তার 'প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও ব্যবহার' বা 'প্রাকটিস্‌' অভিন্নসত্তা, এই যদি মার্ক্‌সীয় প্রজ্ঞানতত্ত্বের মূলকথা হয় তাহলে 'ভারতীয় ইতিহাস' পর্যালোচনা শ্রীডাঙ্গের অধিকার-বহির্ভূত, এমন কথা সমালোচক বলতে পারেন না। অবশ্য তা তিনি বলেননি কোথাও, কিন্তু তবু তাঁর সমালোচনা আদ্যোপান্ত পাঠ করলে মনে হয় যেন এই কথাই তিনি বলতে চান। দত্তের মতন প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিতের কাছ থেকে ডাঙ্গের রচনা সম্বন্ধে পথনির্দেশক একটি সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, কিন্তু তার পরিবর্তে যা পেয়েছি তাতে আমরা

* 'অগ্রণী' কার্তিক সংখ্যা, ১৩৫৮

বাস্তবিকই হতাশ হয়েছি। হতাশ হয়েছি এই জন্য যে সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি 'কমিউনিস্ট পার্টি' ও কমিউনিস্ট সংস্কৃতিকর্মীদের সম্পর্কে এমন সব ঢালাই মন্তব্য করেছেন যা না করলেও তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনার অঙ্গহানি হত বলে মনে হয় না। তা করেও যদি তিনি ক্ষান্ত হতেন তাহলেও নতশিরে আমরা তাঁর কটুকথার সুতীব্র বর্ষণ সহ্য করতাম, নিজেদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা স্মরণ করে ভাবতাম যে বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় গুরুজনের সমালোচনায় বিচলিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তিনি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে মার্ক্‌স এঙ্গেল্‌স্ এর মতবাদকে পযন্ত 'চ্যালেঞ্জ' করেছেন। মার্ক্‌স ও মার্ক্‌সবাদ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: 'মার্ক্‌সবাদের কোন মত যদি আজ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া ধার্য হয় তাহা হইলে তাহা ত্যাগ করিব না কেন?' জনৈক জার্মান বামপন্থী সোশ্যালিস্ট বৈজ্ঞানিক তাঁকে ১৯২০ সালে এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা তিনি প্রণিধানযোগ্য বলে আমাদেরও শুনিয়েছেন: 'কার্ল মার্ক্‌সও একজন মানুষ এবং *Das Kapital* পুস্তকও একজন মানুষের লেখা বই। কেহই অভ্রান্ত নয়।' এই ধরনের 'বামপন্থী সোশ্যালিস্ট বৈজ্ঞানিক' জার্মানিতে খুব বেশি ছিলেন বলেই কি সেখানে কমিউনিজমের ঐতিহাসিক বিপর্যয় ঘটেছিল এবং ফ্যাশিজমের অভ্যুদয় হয়েছিল? জানি না, দত্ত হয়ত আরও ভালভাবে তা জানেন। মার্ক্‌স এঙ্গেল্‌স-এর উত্তরসাধক লেনিন, স্তালিন, মাও সে-তুং প্রমুখ মনীষীদের কোন্ রচনায়, কোন্ বিবৃতিতে, কোন্ নীতির মধ্যে তিনি মার্ক্‌সবাদ যে সনাতনবাদ' বা 'dogma', তার পরিচয় পেয়েছেন? মার্ক্‌সবাদ যে গোঁড়ামি বা সনাতনবাদ নয়, ইতিহাসে তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ হল উত্তরকালে লেনিন, স্তালিন ও মাও-এর সাধনা। মার্ক্‌সবাদ যে 'মতামতসমষ্টি' নয়, একটা বৈজ্ঞানিক methodology—একথা ভুলে গিয়ে, আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার আলোকে দত্ত মার্ক্‌সবাদকেই 'অবৈজ্ঞানিক' বলে উড়িয়ে দিলেন কেন? বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে কি 'বিজ্ঞানবাদ' বা 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই ধ্বংস হয়ে যায়? দত্তের মতে হয়ত যায়, তাই তিনি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অত্যুজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়ে গিয়ে মার্ক্‌স-এঙ্গেল্‌স রচিত গ্রন্থ কেন 'বেদ, বাইবেল ও কোরাণের' মতন অভ্রান্ত হবে প্রশ্ন করেছেন এবং মর্গানকে 'আস্তিকালের বস্তি বুড়ো' বলে বিদ্রূপ করেছেন। 'বিজ্ঞান' যেমন কেবল কোনো বিশেষ যুগের একজন বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ মতামত নয়, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের একটা 'টেক্‌নিক'. মার্ক্‌সবাদও

তেমনি চিন্তা'র, যুক্তির ও কাজকর্মের একটা 'টেক্‌নিক'। 'টেক্‌নিক' মাত্রেরই যুগে যুগে উন্নতি হয়, কিন্তু তার জন্য 'টেক্‌নিকটাই' মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। কামারের 'হাতেগড়া হাতুড়ির' বদলে আজ 'বৈদ্যুতিক হাতুড়ি' হয়েছে বলে হাতুড়ির 'function' মিথ্যা হয়নি, হাতুড়িগত মূল টেক্‌নিকও বদলায়নি। 'টেক্‌নোলজির' ইতিহাস তাই, বৈজ্ঞানিক ইডিওলজিরও'। সামাজিক অনুসন্ধানের ফলে মার্ক্‌সীয় টেক্‌নিকেরও অনেক উন্নতি হয়েছে, এখনও হচ্ছে, কিন্তু তার জন্য মার্ক্‌সবাদের যে বৈজ্ঞানিক কাঠামো সেটা ধসে পড়বে কেন? মার্কিন নৃতাত্ত্বিক মর্গান থেকে লাউই পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের ইতিহাস, এর মধ্যে নৃবিদ্যা ও প্রত্নবিদ্যার বৈপ্লবিক অগ্রগতি হয়েছে, তার ফলে মর্গানের অনেক কথাই অর্ধসত্য প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু মর্গানের সমাজবিজ্ঞানের মূল কাঠামো ধূলিসাৎ হয়ে যায়নি।

এইটুকু গৌরচন্দ্রিকা করে এইবার দত্তের তথ্য-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত কিনা বিচার করা যাক। নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েও এ-কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি শুধু বিষয়ের অত্যধিক গুরুত্বের জন্য। আমি নৃবিজ্ঞান ও প্রাচীন ইতিহাসের একজন অনুসন্ধিৎসু ছাত্র মাত্র, দত্ত এই বিষয়ের পাণ্ডিত্যে ও সাধনায় নিঃসন্দেহে আমার শিক্ষক ও গুরুস্থানীয়। আদর্শ গুরুর ঐতিহ্য অনুসারে তিনি আমার এই আলোচনার ধৃষ্টতা ও অসতর্ক তীব্রতা ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আর ছাত্রের সমালোচনা যদি সামান্য যুক্তিসঙ্গত বলেও গ্রাহ্য হয়, তাহলে তার জন্য গুরুরই গৌরববোধ করা উচিত নয় কি?

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

দত্ত বলেছেন যে তিনি 'প্রধানত বিজ্ঞানের ছাত্র বলিয়া, মর্গানের অসম্পূর্ণ ও সামান্য ভিত্তির (Data) উপর প্রতিষ্ঠিত মতকে, মর্গানের পরে বিগত শতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপর সম্মান দিতে পারেন না'। মার্কিন নৃতাত্ত্বিক লাউইর বিখ্যাত গ্রন্থ *Primitive Society* থেকে তিনি আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উপাদান ও তার ব্যাখ্যান দুইই অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছেন। শুধু লাউই নন, রিভার্স, ম্যালিনাউস্কি, হ্যাডন, ক্রোয়েবার, হার্স্কোভিটস প্রমুখ এযুগের বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানীরা এবং অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড প্রমুখ প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নবিদ্‌রা মর্গানের উপাদন ও unilinear evolutionism-এর ব্যাখ্যান যে অসম্পূর্ণ তা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন। মর্গানের সমালোচনা সকলেই করেছেন, তবে

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিদ্যার অধ্যাপক লাউইর সমালোচনা এবং অন্যান্যদের সমালোচনার মধ্যে মৌল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে। সেকথা পরে বলব। তার আগে দেখা যাক, যে-লাউইর কথায় দম্ভ বিজ্ঞানের ছাত্র বলে মর্গানকে নিদারুণ অবজ্ঞায় ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করেছেন, আধুনিক নৃবিদ্যার জ্ঞানভাণ্ডারে সেই বিচক্ষণ মার্কিন অধ্যাপক লাউইর বিশেষ দান কি? লাউই নিজে তাঁর *Primitive Society*-র ভূমিকায় বলেছেন—**'my book inevitably grew into a persistent critique of Morgan'**—এবং এই হল লাউইর প্রথম দান। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে তা গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে লাউই বলেছেন :

> **The reception accorded to Primitive Society on its appearance varied considerably. Some readers were repelled by the 'negativistic' aspects of the book ; others felt swamped by the mass of detail.**
>
> *Primitive Society*—**Preface, 1949 ed.**

অধ্যাপক লাউইর দ্বিতীয় মূল্যবান দান হল এই **'negativistic attitude'** এবং নঙর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই সুস্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, সমাজবিজ্ঞানীর তো কখনই নয়। আধুনিক নৃবিজ্ঞানের অন্যতম সাধক ও প্রবর্তক রিভার্স **'American Anthropologist'** পত্রিকায় লাউইর বিখ্যাত গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর বই **'will be of greatest value to students as a *record* of early forms of social institution"** (**Italics** লেখকের), কিন্তু তিনি লাউইর **'historical pusillanimity'** বা 'ঐতিহাসিক কাপুরুষতার' বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন। আধুনিক যুগের মার্কিন নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে দিক্‌পালস্বরূপ অধ্যাপক ক্রোয়েবারও উক্ত পত্রিকায় লাইউর **'negativistic attitude towards broader conclusions'** এবং **'comparative sterility'** সম্বন্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। লাউইর ***Primitive Society*** আদ্যোপান্ত পাঠ করলে (প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের অবশ্য পাঠ করা উচিত) যে-কেউ তাঁর অসাধারণ তথ্যসংকলনশক্তি দেখে মুগ্ধ হবেন, কিন্তু তার ঐতিহাসিক নিটোল দৃষ্টিশক্তির শোচনীয় অভাব ও চিন্তার বন্ধ্যতা দেখে প্রকৃত বিজ্ঞানী যাঁরা তাঁরা ক্ষুব্ধ হবেন। হয়েছেনও তাই।

অধ্যাপক মাইকেল ফস্টারের বিখ্যাত কথা—'hypothesis is the salt of science'—লাউই উপলব্ধি করতে পারেননি বলেই মনে হয়। বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ প্রত্যেক বিজ্ঞানীরই কর্তব্য, কিন্তু সেই অনুসন্ধানলব্ধ স্তূপাকার তথ্য যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিশ্লেষণীশক্তির প্রভাবে সমীকৃত হয়ে নিটোল 'জেনারালাইজেশনে' রূপায়িত না হয়, তাহলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অধ্যাপক হ্যাডন এইজন্যই তাঁর *History of Anthropology* গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন

> It is one of the most important functions of stay-at-home synthetic students laboriously to cull data from the vast literature of anthropology, travel and ancient and modern history and to weld them into coherent hypotheses.' (A. C. Haddon : *History of Anthropology*— (Preface).

অধ্যাপক লাউই প্রধানত একজন 'রেকর্ডার', 'ক্রনিকলার' বা সংকলক, 'ওয়েল্ডার' নন্। তাই তাঁর গ্রন্থ পাঠ করে ক্রোয়েবারের ভাষায় খেদোক্তি করতে হয় –'One sometimes sighs regretfully that the honesty of the method which is so successfully exemplified here is not stirred into quicker pulse by *visions* of more ultimate enterprise.' (Italics লেখকের)। মার্কিন নৃতাত্ত্বিক ফ্রাঞ্জ বোয়াস ও ক্লার্ক উইসলারের উদ্‌যোগে 'কালচারের' যে 'trait-complex-pattern' বিশ্লেষণের সূত্রপাত হয়, (যাকে টাইলর-পন্থী ব্রিটিশ ইভলিউশনিস্ট ও এলিয়টপন্থী ডিফিউজনিস্টদেরই একটা নতুন ধারা বলা চলে) লাউই সেই ধারারই প্রশস্ত পথটা ছেড়ে দিয়ে কেবল 'ট্রেট' বা বিচ্ছিন্ন উপকরণের অলিগলিতে বিচরণ করেছেন। 'বিচ্ছিন্ন' উপকরণের বাই-লেন যে বদ্ধ চোরাগলি এবং শেষ পর্যন্ত সেই চোরাগলিতে প্রবেশ করে লাউই মানুষের ইতিহাসে যে কোনো প্রশস্ত রাজপথের (অবশ্যই আঁকাবাঁকা) হদিশ পাবেন না তা তাঁর গ্রন্থের প্রান্তে পৌঁছলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। অফুরন্ত উপকরণ ও তথ্যের মহারণ্যে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে, মর্গান টাইলর রিভার্স প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের (শুধু মর্গানকে নয়) মতামত খণ্ডন করে, লাউই অন্ধের মতন শেষ পর্যন্ত আর পথের সন্ধান পেলেন না।

তথ্যের পর্বতচূড়া থেকে বিরাট 'প্রিমিটিভ' গর্জের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন 'To that planless hodgepodge, that thing of shreds and patches called civilisation, its historian can no longer yield superstitious reverence.'[১] আশার কথা যে আজও অধিকাংশ সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী মানবসভ্যতাকে 'planless hodgepodge' 'shreds and patches' মনে করেন না এবং সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নয়, রীতিমত বৈজ্ঞানিক কারণেই সভ্যতার ভবিষ্যতের উপর তাঁরা এতটুকু আস্থা হারাননি।

এখন কথা হচ্ছে, এ-হেন 'হজপজপন্থী', 'শ্রেড-প্যাচপন্থী' মার্কিন নৃবিজ্ঞানীর অনুরাগী হয়ে উঠলেন কেন শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয়? আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে লাউই নিঃসন্দেহে অন্যতম, কিন্তু আধুনিক নৃবিদ্যার প্রগতি ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনিই একমাত্র অধিবক্তা, এ ধারণা তাঁর কোথা থেকে হল? যেহেতু লাউই সযত্নে এবং অনেকটা অশ্রদ্ধার সঙ্গে মর্গানকে উড়িয়ে দিয়েছেন, সেই জন্য 'মার্কসবাদী' দত্ত তাঁকে 'আগুিকালের বগুিবুড়ো' বললেন এবং নৃবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিচলিত হয়ে আরও কয়েকধাপ এগিয়ে গিয়ে মার্কস-এঙ্গেল্‌সকেও বাতিল করে দিলেন। 'বিজ্ঞানের ছাত্র' হিসেবে মর্গান ও মার্কস্ এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ-সন্নিবেশিত কোনো বিশেষ উক্তি তিনি স্বচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করতে পারেন, তাকে নতুন অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য দিয়ে একশোবার পরিপূরণ করতে পারেন, কিন্তু 'মার্কস্‌বাদকে' বর্জন করতে চান কেন? এটা কি বাস্তবিকই নৃবিজ্ঞানের অগ্রগতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, না বিকৃত বিজ্ঞানে মোহগ্রস্তের দিক্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য উগ্রগতি? দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, দত্তের আলোচনার মধ্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে (থাকাই স্বাভাবিক), কিন্তু বৈজ্ঞানিক 'অগ্রগতির' স্বাক্ষর তার মধ্যে নেই, আছে অবৈজ্ঞানিক 'উগ্রগতি' ও 'উল্লম্ফনের' স্থূল পদচিহ্ন। সমাজ-বিজ্ঞানের আদি-প্রবর্তকদের তিনি অশ্রদ্ধাভরে পদদলিত করেছেন, কিন্তু শ্রদ্ধাভরে তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনার মধ্যে কিছুই গড়ে তুলতে পারেননি। মুক্তচিত্ত মার্কস-বাদী ও 'বিজ্ঞানের ছাত্রের' কাছ থেকে কালাপাহাড়ী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা যায় না।

সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাসে মর্গানের স্থান ও দান

হ্যাডন তাঁর 'নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন যে, বিগত শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ

সমাজবিজ্ঞানী হলেন মর্গান, এবং তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (*Ancient Society*) 'পরিবার ও আত্মীয় সম্বন্ধের' বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পাকাপোক্ত ভিত স্থাপন করে গেছেন।[২] পারিবারিক ক্রমবিকাশের একটা 'স্কীম' বা ছক্ তিনি তৈরি করেছিলেন 'শ্রেণীবাচক' সম্বোধন-শব্দের (Classificatory Kinship terms) ভিত্তিতে। এই বৈপ্লবিক অনুসন্ধানরীতির আদিপ্রবর্তক ও আবিষ্কর্তা মর্গান। আধুনিককালে রিভার্স এই অনুসন্ধানরীতির আরও অনেক উন্নতিসাধন করেছেন এবং মর্গান-প্রবর্তিত এই পদ্ধতিই আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে অনুসন্ধানের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার। মর্গান যে-কালে যে অপর্যাপ্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করেছিলেন তাতে তাঁর ছক্‌টা হয়ত আজ অদলবদল করতে হতে পারে, কিন্তু তবু হ্যাডন বলেছেন যে—'The greater part of Morgan's work is, however, of lasting value'. আধুনিককালে মর্গানের অন্যতম উত্তরাধিকারী (অন্ধ ভক্ত নন্) ডাঃ রিভার্স এই জন্যই মর্গানবিরোধীদের লক্ষ্য করে মর্গানের উক্ত 'স্কীম' বা ছক্ সম্বন্ধে বলেছেন[৩]

> ....in recent years the scheme has encountered much opposition .. the opponents of Morgan have made no attempt to distinguish between different parts of his scheme, but *having shown that some of its features are unsatisfactory, they have condemned the whole.* (Italics লেখকের)

মর্গান-আবিষ্কৃত অনুসন্ধান-পদ্ধতিই (নৃবিজ্ঞানের ভাষায় 'Geneaological Method' বলা হয়) যে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীর অন্যতম বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার একথা ডাঃ রিভার্স সারাজীবন তাঁর অনুসন্ধান কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন এবং সাম্প্রতিককালের রেমণ্ড ফার্থ প্রমুখ আরও অনেক বিজ্ঞানী এই হাতিয়ারের সাহায্যে আশ্চর্য কাজ করেছেন। লাউই নিজেও এই পদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারেননি, যদিও মর্গানের কাছে ঋণস্বীকার তিনি করেননি এবং ডাঃ রিভার্সেরও যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন, এমন কি তাঁর 'নেগেটিভ কম্‌প্লেক্স'-এর জন্য তিনি 'Classificatory' কথার বদলে 'Dakota terminology' (ডেকোটা কৌমের নামানুকরণে) শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৪] পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

নৃবিজ্ঞানীরা আজ প্রায় একবাক্যে মর্গান-প্রবর্তিত এই 'Genealogical method'-কে অন্যতম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের হাতিয়ার বলেন[৫]

> The genealogial method has proved of such value in anthropological research that it is now considered an essential technique in sociological investigation.

বৈজ্ঞানিকের কাছে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পদ্ধতি বা methodology-টাই বড় কথা, কোনো বিশেষ কালে অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য বা সেই তথ্যনির্ভর তত্ত্বটা নয়। বিজ্ঞানের অর্থই তাই, মার্ক্সবাদ ও মর্গানবাদেরও। সেই কারণেই সমাজবিজ্ঞানী অনুসন্ধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ও হাতিয়ারের আবিষ্কর্তা মর্গান ১৮৭৭ সালে তাঁর 'আদিম সমাজ' গ্রন্থ লিখলেও আজও তিনি 'আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো' হয়ে যাননি। মর্গানের 'স্কীম্' বা ছকের বিভিন্ন অংশ আজ নিশ্চয়ই আরও অনেক পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে, সংশোধিতও হতে পারে, কিন্তু আজও তা সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়নি। মার্ক্সবাদের সঙ্গে মর্গানবাদের যে গভীর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল তা-ও 'আকস্মিক' কারণে নয় 'ঐতিহাসিক' কারণে।

মর্গানবাদ ও মার্ক্সবাদ

মার্ক্স ও এঙ্গেল্স যে মর্গানের 'সামাজিক ক্রমবিকাশে'র স্কীম্ গ্রহণ করেছিলেন সে-সম্বন্ধে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড বলেছেন 'That was no accident'. ১৮৫৯ সালেই মার্ক্স তাঁর 'Critique'-এর মধ্যে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার ধারা বিশ্লেষণ করেছিলেন—এবং ঠিক সেই বছরেই ডারুইনের *Origin of Species* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। মার্ক্স ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সভ্য-সমাজ থেকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যার ধারাগুলি তিনি আদিম মানব সমাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন, কিন্তু নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সেরকম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই তিনি মর্গানের দিকে আকৃষ্ট হন। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড এ-সম্বন্ধে বলেছেন[৬]

> The latter (মর্গান) had collected data of just the kind suited for illustrating the Materialist Conception of History. The criteria he used for distinguishing

> between Savagery, Barbarism and Civilisation, if not precisely 'forces of production'—still less, modes of production—at least approximated more closely thereto than the criteria expounded by any other school at that time.

সমালোচক দত্ত নিশ্চয়ই অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডকে এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ-বিজ্ঞানী ও প্রত্নবিদ্ বলে স্বীকার করবেন। মর্গানের 'ছক্' আজও যে 'সম্পূর্ণ' সমর্থনযোগ্য, এমন কথা গর্ডন চাইল্ডও বলেন না। তিনি বলেন: 'In detail it is untenable. Yet it remains the best attempt of its kind.'[৭] তাই প্রত্নবিদ্ হিসেবেও অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড মর্গান-কল্পিত মূল কাঠামোটাকে স্বীকার করেন এবং তাঁর *What Happened In History* গ্রন্থে তিনি মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সেই বৃহত্তর 'ছকের' মধ্যেই বর্ণনা করেছেন। প্রধানত মর্গানের উপর নির্ভর করে ১৮৮৪ সালে এঙ্গেলস্ *The Origin of the Family, Private Property and the State* লেখেন এবং আধুনিক অনুসন্ধানের আলোকে মর্গানের ছকের অনেক অংশ যেমন আজ সংশোধন ও পরিপূর্ণ করা দরকার, এঙ্গেলসের গ্রন্থেরও ঠিক তাই দরকার। বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে, নতুন অনুসন্ধানের ফলে এই পরিপূরণের কাজ কিন্তু সর্বদাই চলতে থাকে

> That shading out of sharply-drawn lines is an inevitable result of greater knowledge. If you compare the attempts to construct human pre-history of fifty years ago with the attempts to construct the pedigree of human evolution you find the same thing. A great many gaps have been filled in.[৮]

ডারুইন্, হাক্সলে ও হেকেলের পর আমরা 'Fish' ও 'Amphibian', 'Reptile' ও 'Mammal'-এর মধ্যবর্তী কয়েকটি জীবাশ্মের নমুনা পেয়েছি এবং মেরুদণ্ডী জীবের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের 'ধারাবাহিকতা' তার ফলে আরও অনেক সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন কি 'এনথ্রপয়েড এপ্' ও আদিমতম মানব বা মানবসদৃশ জীবের এতগুলি ফসিল আজ পাওয়া

গেছে যে মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আজ প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বর্ণনা করা যায়।* কিন্তু তার জন্য কি ডারুইন্, হাক্সলে ও হেকেল আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন? তা হননি, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মর্গান ও এঙ্গেলস্ তাই আজও বর্জনীয় নন। হলডেন বলছেন

> In spite of that (অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রগতি সত্ত্বেও), however, the pricipal conclusions at which Huxley and Haeckel arrived *from a starting point* for an account of evolution, and are *still true*. My own view is that the *same holds good to a very large extent for the system laid down by Engels,* though there are certain parts of his scheme (Origin of Family etc গ্রন্থের) which are obviously doubtful and a few which are probably false. (Italics লেখকের)

মার্ক্স ও মর্গানের পর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি হয়েছে, কিন্তু তার জন্য তাঁরা কেউ 'বস্তিবুড়ো' হিসেবে বাতিল হয়ে যাননি। তার কারণ তাঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল, সমস্ত তথ্য সমীকৃত করে যে সামাজিক বিকাশ-ধারার ছক্ তাঁরা তৈরি করেছিলেন তা পরবর্তীকালের গবেষণার ফলে সংশোধিত ও সমৃদ্ধ হলেও, মানবেতিহাসের রেখাচিত্ররূপে আজও তা ম্লান হয়ে যায়নি। প্রকৃত মার্কসবাদী মাত্রেই মার্কসবাদ-মর্গানবাদের এই গতিশীলতা সম্বন্ধে সচেতন এবং সমালোচক দত্তের অনেক আগেই মার্কসীয় চিন্তানায়করা মর্গান-এঙ্গেলস্-এর মতামত পরিপূরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেছেন, কিন্তু 'বিজ্ঞানের ছাত্র' দত্তের মতন কেউ তাঁদের অবজ্ঞাভরে বর্জনীয় মনে করেননি। দত্তের 'মার্কসবাদের' সঙ্গে হলডেন বা গর্ডন চাইল্ডের মতন অধিকাংশ বিজ্ঞানী, প্রত্নবিদ্ ও সমাজ-বিজ্ঞানীর 'মার্কসবাদের' মূলগত পার্থক্য এইখানে। জড়বাদী ও নৈরাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে মার্কস-এঙ্গেলস্-মর্গানের বৈজ্ঞানিক দানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

আদিম সাম্যবাদ

ইতিহাসের কোনকালে মানবসমাজ যে 'আদিম সাম্যবাদের' স্তরে ছিল, একথা দত্ত আধুনিক নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে অস্বীকার করতে চান। তিনি লাউইর

মত উদ্ধৃত করে বলেছেন যে: 'মানবজাতি (১) **Primitive Communism,** তৎপর (২) **Family Communism** তৎপর (৩) **Individualism**—এই ছক আঁকিয়া বিবর্তিত হয় নাই। প্রথমোক্তটি কোথাও হয় নাই, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ইহার সঙ্গে বিজড়িত ছিল বা আছে।' প্রথমত বলা দরকার যে 'কমিউনিজম' সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে লাউইর মতন কয়েকজন নৃবিজ্ঞানী 'আদিম সাম্যবাদকে' অস্বীকার করেন। দত্ত সেই একই ধারণা থেকেই কি তাঁদের মতামত গ্রহণ করেছেন? ব্যবহায জিনিসপত্রের উপরেও ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না, এমন কথা 'কমিউনিজম' কোনকালেই কল্পনা করেনি এবং সেই জাতীয় মালিকানা থাকলেও তা 'কমিউনিজমের' পরিপন্থী হয় না। মূল প্রশ্ন হল উৎপাদনযন্ত্রেব (**Tools** বা **Means of Production**) স্বত্বাধিকার নিয়ে। অনেক 'পণ্ডিত' এইখানেই 'আদিম সাম্যবাদের' স্বরূপ বুঝতে গণ্ডগোল করেছেন, লাউইর মতন ডায়মণ্ডও তাঁব *Primitive Law* গ্রন্থে একই ভুল করেছেন।[১১] লাউই বা ডায়মণ্ড মার্কস্‌বাদী নন, 'কমিউনিজম্' সম্বন্ধে বিকৃত রোমান্টিক কল্পনা তাঁদের থাকতে পাবে, কিন্তু দত্তের মতন প্রবীণ মার্কস্‌বাদীর এ-ধারণা কোথা থেকে হল? কমিউনিজম সম্বন্ধে ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের 'অ্যালিসেব' ধারণা যদি তাঁর না থাকত তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে মানবসমাজের ইতিহাসে 'আদিম সাম্যবাদের' স্তর আরও বেশি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে কমিউনিজমের কোনো বিরোধ নেই, উৎপাদনযন্ত্রাদির মালিকানার সঙ্গেই তার বিরোধ। ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে যদি অস্থাবর ও স্থাবব এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে আদিম মানবসমাজে প্রধানত চারশ্রেণীর অস্থাবর সম্পত্তি দেখা যায়:

ক। খাদ্যদ্রব্য

খ। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস

গ। গৃহের আসবাবপত্র

ঘ। কৃষির যন্ত্রপাতি

ডায়মণ্ড বলছেন: **'Perhaps these four classes become important in the order in which they are stated, from the 1st Hunters to the 3rd Agricultural Grade.'**[১২] তাহলে

কৃষি-সভ্যতার তৃতীয় পর্বে কর্ষণযন্ত্রপাতির মালিকানার বিকাশ হয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়াও আদিমসমাজে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে 'পশু' (Cattle) ও 'দাস' (Slave) উল্লেখযোগ্য। এ-সম্বন্ধে হবহাউস-হুইলার-জিনস্বার্গ বলেছেন যে শিকারযুগের প্রথম পর্বে দাসদের দেখা যায় না। যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হবার পর শিকারযুগের দ্বিতীয় পর্বে তিনভাগের একভাগ শিকারজীবী-কৌমের মধ্যে 'দাসের' চলন দেখা যায়। পশুপালন ও কৃষিযুগের প্রথম পর্বেই দাসের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয়, কিন্তু কৃষির তৃতীয় পর্ব থেকেই দাসপ্রথার বিস্তার হতে থাকে।[১৩] তারপর জমির (Land) উপর ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব সম্বন্ধে ডাঃ ডায়মণ্ড বলেছেন[১৪]

> ...looking at the general history of property in land, it is of *first importance* to notice that the extent of communal property in land does not vary from the 1st Hunters up to the 3rd Agricultural Grade, and has throughout a *wider field* than what may be called private property. (Italics লেখকের)

ডায়মণ্ড এই প্রসঙ্গে হবহাউস-হুইলার-জিন্সবার্গের Statistics উদ্ধৃত করেছেন পাদটীকায়। এই 'সমষ্টিগত সম্পত্তির' প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল সে সম্বন্ধে নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মতভেদ আছে—অর্থাৎ এই সম্পত্তি 'tribe', 'sib', বা 'family'-র ছিল কি না, বা এর মধ্যেও কোনো ধারাবাহিক বিকাশের চিহ্ন পাওয়া যায় কি না, তা নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও আলোচনা আজও হয়নি। কিন্তু তা না হলেও, অস্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল বলে এবং সমষ্টিগত স্থাবর সম্পত্তি (পশু, দাস ইত্যাদি) কোথাও কৌমগত, কোথাও গোত্রগত ('গোত্র' ক্ল্যান্ বা সিব্ অর্থে), কোথাও পরিবারগত ছিল বলে, 'আদিম সাম্যবাদের' কোনো সামাজিক স্তর ইতিহাসে কোনকালে কোথাও ছিল না, এত বড় হঠোক্তি করা বিজ্ঞানের ছাত্রের উচিত নয়। লাউই এমন কথা (অর্থাৎ সাম্যবাদ কোথাও ছিল না) নিজেও বলতে সাহস পাননি। 'আদিম সমাজ' গ্রন্থে 'সম্পত্তির' আলোচনাপ্রসঙ্গে লাউই মেরুবাসী এস্কিমোদের বিষয় বলেছেন যে, 'many of their usages smack of communism' এবং তাদের সুপ্ত ব্যক্তিচেতনার কথা উল্লেখ করেও তিনি মেরুবাসীদের আদিম সমাজকে 'unusually communistic societies' বলেছেন।[১৫] দত্ত প্রথমত 'উদোর

পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপিয়ে, বিচ্ছিন্ন উপকরণ থেকে 'জেনারালাইজ' করে, এবং দ্বিতীয়ত 'কমিউনিজম' সম্পর্কে বিকৃত কাল্পনিক ধারণার বশবর্তী হয়ে 'আদিম সাম্যবাদ'কে বাতিল করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ডের একটি চমৎকার উক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি[১৬]

> Private property in weapons, tools and ornaments used and worn by an individual is *quite compatible* with primitive communism and is recognised among even the simplest savages today But among such savages the hunting-grounds are generally 'owned' by the clan collectively and the proceeds of the chase are usually divided among all members of the group.
>
> Property in *means of production* is in a very different position. To barbarians this means primarily land and livestock. The recognition of proprietary rights, such as that of buying and selling land like a commodity, results from a *slow process in historical time. No archaeological data* that could even serve as a basis for discussion on the ownership of farmland are available till late in the Iron Age. (Italics লেখকের)

ডাঙ্গে ও দত্ত

ডাঙ্গের সমালোচনা প্রসঙ্গে দত্ত যে দীর্ঘ 'গৌরচন্দ্রিকা' করেছেন এতক্ষণ তারই আলোচনা করা হল। দত্তের এই গৌরচন্দ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ উক্তি সম্বন্ধেই আমার সামান্য যা বক্তব্য ছিল তা বলেছি। ডাঙ্গের গ্রন্থ সম্বন্ধে দত্ত যে সমালোচনা করেছেন তার অধিকাংশই আমি সমর্থন করি, যদিও আর্য', 'গণ', 'গোত্র' ও 'বিবাহ পদ্ধতি' সম্বন্ধে তাঁর অনেক যুক্তির সঙ্গে আমি একমত নই। ডাঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করলে কনরাড স্মিড্‌টকে একখানি চিঠিতে লেখা এঙ্গেল্‌স-এর একটি কথা মনে পড়ে: **'The materialist conception of history has a lot of friends whom it serves as an excuse for not studying**

history.'[১৭] ডাঙ্গের মতন একজন প্রবীণ মার্কসবাদী ইতিহাস' পাঠ করেননি, এমন কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু তবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে ভারতীয় 'প্রাগিতিহাস' ও 'প্রাচীন ইতিহাস' সম্বন্ধে আধুনিক প্রত্নবিদ্ ও নৃবিদ্‌দের অনুসন্ধানলব্ধ পর্যাপ্ত উপাদানের কোনো সাহায্যই গ্রন্থ প্রণয়নে তিনি গ্রহণ করেননি। এই দিক দিয়ে দত্তের সমালোচনা যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু দত্ত যে নিজের কথা বলেছেন তাতেও উৎসাহিত হবার মতন বিশেষ কিছু নেই। তিনি তাঁর 'ভারতায় সমাজপদ্ধতি' গ্রন্থে বলেছেন: 'ভারত-বর্ষের সভ্যতার ইতিহাস পূবে বৈদিক যুগ হইতেই ধরা হইত; এখন মহেন্-জো দাড়োর যুগ হইতে ধরা হয়। কিন্তু বৈদিক সময় হইতে ভারতীয় ইতিহাসের ধারা নিববচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় চলিতেছে। এইজন্য সামাজিক ইতিহাসের মূল উৎস সেই সময় হইতেই ধরিতে হইবে'[১৮] নৃবিজ্ঞানী দত্ত যদি ভারতের সামাজিক ইতিহাসের 'মূল উৎস' বৈদিক যুগেই সন্ধান করেন, তাহলে বলতে হয় যে ভারতীয় প্রত্নবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আধুনিককাল পর্যন্ত সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়েছে। একজন প্রবাণ মার্কস্‌বাদী ও নৃবিজ্ঞানী 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতির' ইতিহাস লিখছেন ১৯৪৫ সালে এবং তার মধ্যে আধুনিক নৃবিজ্ঞান ও প্রত্নবিদ্যার অনুসন্ধানলব্ধ কোনো উপকরণ নেই, একথা কল্পনাই করা যায় না। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি—ভারতের বিবাহ-পদ্ধতি, গোত্র, গণ ইত্যাদির 'মূল উৎস' তিনি কোথায় সন্ধান করবেন? ভারতীয় 'হিন্দুধর্ম' বা 'জাতিপ্রথার' উৎস কোথায়? যে পুরোহিতদের (Priests) সম্বন্ধে দত্ত খুবই ক্রুদ্ধ ও সজাগ, তাদের ইতিহাস কি বৈদিক যুগ থেকেই শুরু হয়েছে? আদিপ্রস্তরযুগ থেকে সিন্ধুসভ্যতার তাম্র-প্রস্তরযুগ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে বৈদিকযুগ পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ ইতিহাস সেটা কি 'ভারতীয় ইতিহাস' নয়? নৃবিজ্ঞানী ও প্রত্নবিজ্ঞানীদের অক্লান্ত অনুসন্ধানের ফলে তার 'নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা' যে আজ প্রমাণিত হয়েছে তা কি সুপণ্ডিত দত্ত জানেন না, অথবা জেনেও অস্বীকার করতে চান?[১৯] এইজন্যই তাঁর 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতি' মার্কসীয় বা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস হিসেবে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে। মার্কস্ নিজে তাঁর ইতিহাসব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তাঁর 'পদ্ধতির' প্রধান লক্ষ্য হবে—'Studying each form of evolution separately and then comparing them'—এবং এই পদ্ধতিতে একটি জিনিস সর্বদা বর্জনীয়, সেটি হচ্ছে—'the universal passport of a general

historico-philosophical theory, whose supreme virtue consists in being super-historical'[২০] দত্ত যেভাবে ভারতীয় সমাজপদ্ধতির ইতিহাস আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর তথ্যনিষ্ঠার প্রশংসা করেও বলতে হয় তাঁর '**supreme virtue consists in being super-historical**' তাঁর ক্রটির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তিনি ভারতীয় 'পুরোহিততন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণদের' আলোচনায় আগাগোড়া মারাত্মক **sectarian** মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন—ঐতিহাসিক কালবোধ পযন্ত তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে পুরোহিতশ্রেণীর উদ্ভব বৈদিক যুগের অনেক আগেই হয়েছিল, সিন্ধুসভ্যতার যুগে তো নিশ্চয়ই হয়েছিল। অবশ্য পুরোহিতদের 'মূল উৎস' সন্ধান করতে হলে তারও আগে আদিম মানবসমাজের দিকে তাকাতে হয় সেখানকার 'জাদুকর', 'শমন', ওঝা' ইত্যাদি থেকেই কি পরবর্তীকালের পুরোহিতদের বিকাশ হয়নি ?[২১] নৃবিজ্ঞানী হয়েও দত্ত তাঁর উক্ত গ্রন্থে এবং *Studies in Indian Social Polity*-র মধ্যেও এসব বিষয়ে কিছুই আলোচনা করেননি, বোধহয় প্রয়োজনই অনুভব করেননি। সুমের ও বাবিলন-সভ্যতার কালে এই পুরোহিতশ্রেণী '**learned leisured class**'-এ পর্যবসিত হয়েছে, আমাদের সিন্ধুসভ্যতার যুগেও তাই হয়েছিল বা হচ্ছিল বলে মনে হয়। শ্রেণীসভ্যতার বনিয়াদের উপরেই যে এদের বিকাশ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইতিহাসের সেই যুগে এই পুরোহিতশ্রেণীর একটা ঐতিহাসিক প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড এই ভূমিকা চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন[২২]

> **To them (পুরোহিতশ্রেণী) fell the task of translating the practical activities of ritual into conceptual theologies or mythologies, and the traditional lore of craftsmen, surveyors and architects into theoretical sciences. But their societies were already class societies.. This was a new stage in human history. Never before had there been a class dedicated to thinking about the environment undistracted by the constant need of getting a living through physical action on the environment.**

আমাদের ভারতবর্ষে সিন্ধুসভ্যতার যুগের পুরোহিতদের 'প্রারব্ধ' কাজই ('প্রারব্ধ' এইজন্য বলছি যে এ-যুগের ভাষা আজও decipher করা সম্ভব হয়নি, সুতরাং সেই ভাষায় কি লেখা হয়েছে না-হয়েছে জানা যায়নি) উপনিষদ ব্রাহ্মণ ধর্মশাস্ত্র ও সূত্রযুগে পরিপূর্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। এই যুগ ভারতীয় ইতিহাসেরও একটা **'new stage'**, যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা **practical ritual**-কে **'conceptual theologies'** ও **'mythologies'**-এ রূপায়িত করেছেন। ভারতীয় সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির স্থিতিশীলতার জন্য ব্রাহ্মণরা এই জ্ঞানসমৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছেন অনেককাল পর্যন্ত, যখন 'আয়ুর্বেদশাস্ত্র' ও শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে তাঁরা কারিগর ও ওঝাদের **'traditional lore'** কে **'theoretical sciences'**-এ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা মার্কস্‌বাদী দত্তের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাই তিনি মন্ত্র শ্লোক ও শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করে ব্রাহ্মণদের শ্রেণীসুলভ শোষণবৃত্তির ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ব্রাহ্মণরা দান' সম্বন্ধে কোথায় কি বলেছেন, তার মধ্যে শোষণের প্রবৃত্তি কতটা প্রকট হয়ে উঠেছে, সেটা তাৎকালিক সামাজিক ইতিহাসের একটা সামান্য দিক মাত্র, 'সমগ্র ইতিহাস' নয়।[৩] দত্তের সঙ্গে হের ড্যুরিং-এর চিন্তাধারার অনেক সাদৃশ্য আছে, সেইজন্য তাঁকে নতুন করে (আগে তিনি অবশ্যই পড়েছেন) আরএকবার এঙ্গেলস্‌-এর *Anti-Duhring* গ্রন্থ পাঠ করতে অনুরোধ করছি। ডাঙ্গের 'কল্পনাপ্রধান' কাহিনী রচনা হয়ত মার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু দত্তের এই 'হের ড্যুরিং-তুল্য' মনোভাব কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত ? একেই কি মার্কসবাদী ইতিহাসব্যাখ্যা বলে, না মার্কসের ভাষায় **'super-historical method'** বলে ?

পরিশেষে একটি কথা বলে আলোচনা শেষ করব। মার্কসীয় বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাব সত্যই অত্যন্ত পীড়াদায়ক। দত্ত যে-ভাষায় ও ভঙ্গিতে মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন তা আমাদের মতন অস্থিরবুদ্ধি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হয়ত বা আশা করা যায়, কিন্তু তাঁর মতন স্থিতপ্রাজ্ঞ পণ্ডিতের কাছ থেকে কখনই আশা করা যায় না। আমাদের ভুলত্রুটি তিনি দেখিয়ে দিন, বুঝিয়ে দিন, তার জন্য ভর্ৎসনা করুন, শিক্ষার্থীর মতন আমরা তা মাথা পেতে গ্রহণ করব— কিন্তু কার উপর অভিমান করে তিনি 'কাকে' নস্যাৎ করলেন ? জানি না,

আমাদের নিজেদের মধ্যে, অর্থাৎ মার্কসবাদীদের মধ্যে, অন্তত সংস্কৃতিক্ষেত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব কবে ফিরে আসবে! তা যতদিন না আসবে, আমার বিশ্বাস, ততদিন মার্কসবাদী হিসেবে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যে যত বড় 'পণ্ডিত' হই না কেন, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে কোন স্থায়ী দান আমরা কিছুই দিতে পারব না এবং দেশের নিষ্ঠাবান পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে আমরা সকলেই হাস্যাস্পদ হয়ে থাকব।

১৩৫৮ | ১৯৫১-৫২

১ R. H. Lowie ; Primitive Society (1949) p. 428

২ A. C, Haddon : History of Anthropology (1945 ed)—pp. 127-129

৩ W. H. R. Rivers-এর এই সব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ দ্রষ্টব্য : A Genealogical Method of Collecting Social & Vital Statistics (J, A. I xxx, 1900) ; On the Origin of the Classificatory System of Relationships (Anthropological Essays—Tylor Volume, 1907) ; দু'খানি বিখ্যাত গ্রন্থ Kinship and Social Organisation (1914) ও The History of Melanesian Society (1914) সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য ডাঃ রিভার্সের Social Organisation গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। রেমণ্ড ফার্থের We, the Tikopia—a Sociological study of Kinship in Primitive Polynesia গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, বিশেষ করে 'Kinship'-এর বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায় পঠিতব্য। আমাদের দেশে ডাঃ রিভার্সের অন্যতম ছাত্র অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Head of the Anthropology Dept.) এই পদ্ধতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের কাজ করেছেন।

৪ R, H. Lowie : Primitive Society (1949 ed) Chap. VII

৫ Notes and Queries on Anthropology (6th Ed. 1951) By a Committee of the Royal Anthropological Institute of Gr. Britain & Ireland—p. 50

৬ Gordon Childe-এর সম্প্রতি প্রকাশিত Social Evolution (1951) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭ Ibid pp. 10-11

৮ J. B. S. Haldane : The Marxist Philosophy and the Scienees (1942 ed) p, 158

৯ এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী E. A. Hooton-এর Up From The Ape (Revised ed. 1946) গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ Fossil Ancestors and Collaterals দ্রষ্টব্য pp. 277-418

১০ হলডেনের পূর্বোক্ত গ্রন্থের 'Sociology' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১১ A. S. Diamond : Primitive Law (2nd ed. 1950) ch XXIV

১২ Ibid (1950) p. 264

১৩ Hobhouse, Wheeler & Ginsbarg; The Material Cultures & Tribal Institutions of Simpler peoples—p. 236

১৪ ডায়মণ্ডের পূর্বোক্ত গ্রন্থ : পৃষ্ঠা ২৭০

১৫ Lowie. Primitive Society (1949 ed) p. 199

১৬ Gordon Childe : Social Evolution (1951) pp. 67-69

১৭ Selected Correspondence—1846-1895 (1943 ed) pp. 472-473

১৮ ভারতীয় সমাজপদ্ধতি : পৃষ্ঠা ৫৮

১৯ এই ইতিহাস আলোচনার জন্য কয়েকখানি গ্রন্থ ও নিবন্ধের উল্লেখ করছি : ১ De Terra & Paterson : Studies on the Ice Age in India and Associated Human Cultures (1939). ২ V. D. Krishna Swamy : Stone Age India (Ancient India-3). ৩ S. N, Chakravarti : An outline of the Stone Age in India (J. R. A. S. B.—vol X, 1944). ৪ S. Piggott : Prehistoric India ৫ R. E. M Wheeler : Harappa 1946 (Ancient India-3)

২০ Selected Correspondence p. 355

২১ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা G. Landtman-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ The Origin of the Inequality of the Social classes দ্রষ্টব্য—বিশেষ করে 'পুরোহিতশ্রেণীর ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে এই গ্রন্থের (১৯৩৮ সালের সংস্করণ) অষ্টম থেকে দ্বাদশ অধ্যায় (১১১-২২৬ পৃষ্ঠা) পঠিতব্য।

২২ Gordon Childe : Social Worlds of Knowledge (Hobhouse Memorial Lecture 1949) pp. 20-21. এ সম্বন্ধে Faankforts, Wilson ও Jacobsen-এর Before Philosophy গ্রন্থ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

২৩ 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতি' ও Studies in Indian Social Polity গ্রন্থের মধ্যে ডা: দত্ত মার্কসীয় পদ্ধতিতে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস-ব্যাখ্যার যে চেষ্টা করেছেন তা অখণ্ড ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বা ভারতীয় সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতির ক্রমিক বিকাশধারা সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা তাঁর গ্রন্থ পাঠ করলে হয় না। তার কারণ বোধ হয়, তথ্যের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল থাকা সত্ত্বেও চিন্তাধারার শৈথিল্য ও অসংলগ্নতার জন্যে তথ্য ও তত্ত্বের কোনো সমীকরণ তাঁর কোনো গ্রন্থেই হয়নি, এবং তার ফলে ইতিহাসের সমগ্রতার রূপটা ধরা পড়েনি। তা হলেও দত্ত নিঃসন্দেহে এই জাতীয় ইতিহাস রচনার একজন অন্যতম পথিকৃৎ এবং একালের মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের পথপ্রদর্শক। আলোচনার মধ্যে আমি বলেছি যে দত্ত 'গণ, গোত্র ও বিবাহ-পদ্ধতি' সম্বন্ধে যা বলেছেন আমার কাছে তা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। কেন হয় না সে সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত আলোচনা এই বিতর্কের মধ্যে করা সম্ভব নয় তবু এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধানীরা সম্প্রতি যে আলোচনা করেছেন তার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডাঃ ইরাবতী কার্ভে 'জেনিওলজিকাল' পদ্ধতি অনুযায়ী 'মহাভারতের' সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য (Karve : 'Kinship Terms and Family Organisation in the Critical Edition of Mahabharata'—Bulletin, Deccan College Research Inst, vol V, 1943-44)। কারাণ্ডিকারের Hindu Exogamy (1929) এবং ডাঃ কাপাডিয়ার Hindu Kinship (1947) গ্রন্থ এই বিষয়ে অবশ্যপাঠ্য বলে মনে হয়। 'জাতি' (Caste) সম্বন্ধে ডাঃ হাটনের Caste in India গ্রন্থ ছাড়া ডাঃ ঘুর্য়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত Caste and class

in India (1950) উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের History of Indian Social Organisation (J. R. A. S. B. vol 1, 1935) নিবন্ধটিও পড়া উচিত। 'বিবাহ-পদ্ধতির' ইতিহাস-প্রসঙ্গে অধ্যাপক এরেনফেলসের Mother-right in India (Oxford, 1941) গ্রন্থ ছাড়াও এই রচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়:

K. P. Chattopadhyay : Satakarni Succession and Marriage Rules (J.R.A.S.B. vol V 1939)
: Korku marriage customs and Some change (J.R.A.S.B, vol XII No 2, 1946)

M. B. Emeneau : Kinship and Marriage among the Coorgs (J.R.A.S.B, vol IV, 1938)

অন্যান্য ভারতীয় আদিম জাতির 'আত্মীয় সম্বোধন রীতি' ও 'বিবাহ-পদ্ধতি' সম্বন্ধেও জানা প্রয়োজন—বিশেষ করে সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, হো, শবর, জুয়াং, গারো, খাসি, নাগা, আগারিয়া, বাইগা, গণ্ড, মুরিয়া, চেঞ্চু, টোডা, ও ভেদ্দদের সম্বন্ধে। এগুলি এ-বিষয়ের সম্পূর্ণ পাঠ্যতালিকা যে নয় তা বলাই বাহুল্য। বিখ্যাত গ্রন্থের কোনো তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলেই দিলাম না। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ধারা নির্দেশ করবার জন্যে এইটুকু উল্লেখ করলাম, অবশ্য দক্ষের জন্যে নয়, অন্যান্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্যে।

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানারকমের চিন্তার বিকাশ হয়েছে মানুষেব বিচিত্র বহুমুখী কর্মজীবনেব ঘাতপ্রতিঘাতে। মানবচিন্তা বায়ুজাবী নয়, সমাজের বাস্তব উপকরণজীবী। অন্নচিন্তা থেকে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক চিন্তা, নির্জন আত্মচিন্তা ও ব্যক্তিচিন্তা থেকে জনমুখী সমষ্টিচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তা সমস্তই বিশেষ বাস্তব সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা বা রাজনৈতিক চিন্তারও উদ্‌ভব হয়েছে একটা বিশেষ সামাজিক পরিবেশ রচিত হবার পরে এবং সেই রাষ্ট্রচিন্তা যে বাংলা দেশের জাতীয় ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় জাতীয়তা-বোধে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তার কারণও ঐতিহাসিক। প্রবহমান ইতিহাসের তরঙ্গ বাঙালীর জীবন ও সমাজকে তখন আলোড়িত করেছে সবচেয়ে বেশি, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মৃদু কম্পনের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। দেশ-বিদেশের বহুবিধ চিন্তার ধারা তখন বাংলার সামাজিক স্তরে (যেমন মধ্যবিত্ত ও ইংরেজিশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী) মিলিত হয়ে প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি করেছে। সেই আবর্ত ও বিক্ষোভের ভিতর দিয়ে বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছে ভারত অভিমুখে, একটা অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধের দিকে।

ঐতিহাসিক পোলার্ড তাঁর 'ফ্যাক্টর্‌স ইন্‌ মডার্ন হিস্ট্রি' গ্রন্থে বলেছেন যে কলম্বাস, ভাস্কো-ডা গামার ভৌগোলিক আবিষ্কার, বিজ্ঞানীদের প্রাকৃতিক রহস্য উদ্‌ঘাটন, বাষ্পীয় শক্তি বিদ্যুৎ ও যন্ত্রাদির আবিষ্কার, মধ্যযুগ থেকে আধুনিকযুগে যাত্রার পথে বড়-বড় ঘটনা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অনেক

ঘটেছে, আজ অনেকেরই তা অজানা নেই। কিন্তু এইসব বড় ঘটনার অন্তরালে সমাজে আরও কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যা নামডাকে বড় না হলেও, ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক থেকে আদৌ উপেক্ষনীয় নয়। পোলার্ডের ভাষায়: **'These may almost be summed up in one phrase—the advent of the middle classes.'** সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অভ্যুদয় এরকম একটি ঘটনা। এই মধ্যবিত্তের অভ্যুদয় না হলে ইয়োরোপে সাহিত্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে রেনেসাঁস, ধর্মের ক্ষেত্রে রিফর্মেশন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধনতন্ত্র, অবাধ বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে 'ন্যাশনালিজম' বা 'জাতীয়তাবাদ' কোনো কিছুরই বিকাশ সম্ভব হত না। জনসমাজের একটা অংশ (মধ্যবিত্তশ্রেণী) ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে সর্বাধিক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সমাজের অগ্রগামিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে, যেমন বর্তমানের আরএক সন্ধিক্ষণে শ্রমজীবীশ্রেণী সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণেই আধুনিক 'ন্যাশনালিজম' বা জাতীয়তাবোধ জনমানসে একটা প্রত্যয়রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল, আমাদের বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে তার ব্যতিক্রম হয়নি। অবশ্য হবার কথাও নয়।

যে-সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক ঘটনার সন্নিবেশের ফলে আধুনিকযুগে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবোধের বিকাশ সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হল—যান্ত্রিক মুদ্রণের আবিষ্কার ও প্রসার, বুদ্ধি ও যুক্তির বাহনোপযোগিতার স্তরে জাতীয় ভাষার বিকাশ (অর্থাৎ জাতীয় গদ্যভাষার বিকাশ), ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা, মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব—বিশেষ করে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর, আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ভৌগোলিক অঞ্চলবন্দী মানুষের মুক্তি ও সচলতা (**mobility**) বৃদ্ধি, সংযোগ সান্নিধ্য ও আদানপ্রদানের স্বাধীনতা এবং ধীরে ধীরে সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা থেকে সম্প্রসারিত সমাজচেতনার দিকে মানুষের মানসিক উন্মীলন। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে এতগুলি ঘটনার বিচিত্র সংযোগ ও সংঘাত হয়েছিল উনিশ শতকে, ঐতিহাসিক কারণে। যতটা ব্যাপকভাবে হয়েছিল, আর কোথাও তা হয়নি। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই প্রথম আধুনিক সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ অঙ্কুরিত হয়ে বাংলার বাইরে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে।

নবযুগের ভারতের আধুনিক ধর্মচিন্তা, সমাজচিন্তা ও রাষ্ট্রচিন্তার অগ্রদূত হলেন রামমোহন রায়। তাঁর সময়ে পূর্বোক্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল বাংলা দেশে, স্বভাবতই পরিমিতরূপে। রামমোহনের যুগদৃষ্টি প্রতিবেশের পর্দা ভেদ করে আধুনিককালের দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল স্বচ্ছন্দে। তাঁর ধর্মচিন্তা তাই সহজে আধুনিক ভারতরাষ্ট্রচিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রচিন্তা বাংলা দেশ তো বটেই, ভারতের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বমানব-চিন্তায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। রামমোহনের কালেই 'বঙ্গদূত' পত্রিকা আমাদের দেশে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : 'অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক' (১৩ জুন, ১৮২৯)। এই শ্রেণীর সর্বাধিনায়করূপে রামমোহনও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাংলার বা বাঙালীর স্বাধীনতা নয়, ভারত ও ভারতজনের স্বাধীনতা।

রামমোহনের পর 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগ, বিদ্রোহী তরুণ শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য বলে যাঁদের 'ডিরোজীয়ান'ও বলা হয়। উনিশ শতকের তিরিশের দশক ডিরোজীয়ানদের স্বর্ণযুগ। তিরিশের আগেই ডিরোজিও কবি-কল্পনায় পরাধীন ভারতের বন্দিনী মাতৃমূর্তিতে গভীর বেদনা প্রকাশ করে লেখেন

স্বদেশ আমার ! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে,
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !

ইংরেজি থেকে অনুবাদ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইয়ং বেঙ্গলের বিতর্কসভা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে সমাজ, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি নানাবিষয়ে আলোচনা হত, বেশ গরম আলোচনা এবং দেশবিদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ও ছিল তার মধ্যে অন্যতম। পরবর্তীকালে, তারুণ্যের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গোত্তীর্ণ বয়সে ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা স্বদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এঁদের দেশপ্রেম কোনদিন প্রাদেশিকতার বা সাম্প্রদায়িকতার বদ্ধ প্রাচীরের প্রতিবন্ধকে খণ্ডিত

হয়নি, সর্বদা এক অখণ্ড ভারতচেতনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু এই ভারতচেতনার বিস্তারের পথ ইয়ং বেঙ্গলগোষ্ঠী প্রশস্ত করতে পারেননি, তার কারণ হল তাঁদের দুর্বলতা ও সংখ্যাল্পতা। শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের স্তর উনিশ শতকের তিরিশে ও চল্লিশে খুব সংকীর্ণ ছিল। ১৮৩৪ সালে, ইংরেজি শিক্ষা সরকারী নীতি হিসেবে গৃহীত হবার (১৮৩৫) আগের বছর, কলকাতার ছোটবড় দশটি স্কুলে মোট ১৮৬৮ জন ছাত্র ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য। তাঁদের মধ্যে পাঁচ-ছশোজন প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। এই মুষ্টিমেয় যুবকদের পক্ষে প্রকাশ্য সমাজপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা ভাবধারা প্রচার করা তখন সম্ভব ছিল না। যা সম্ভব ছিল তাই তাঁরা করেছিলেন, অর্থাৎ সাহিত্যসভা, বিদ্বৎ-সভা ইত্যাদি গঠন করে, সভার আলোচনার ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবধারা প্রচার করা। আরএকটি প্রচারের পন্থা ছিল প্রেস—অর্থাৎ পত্রিকা। কোনো পন্থাই ভারত-চেতনার প্রসারের অনুকূল ছিল না, তাই তার প্রচারও তখন বিশেষ হয়নি। তাতে অবশ্য ভারতচেতনার প্রবক্তা বাঙালীর (মুষ্টিমেয় হলেও) জাতীয়তাবোধ খণ্ডিত হয়নি, কেবল তার বহির্মুখী গতি সঙ্কুচিত হয়েছে।

যে-সমস্ত সভা ও প্রতিষ্ঠান, প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা দেশে বিগত শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে গড়ে ওঠে, তাদের কার্যকলাপে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি (১৮৩৮), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রভৃতি কেবল যে উচ্চশ্রেণীর প্রত্যক্ষ স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, ভারতবোধের প্রসারেও ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীয় সভার আমলে সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রথমে মাদ্রাজ বোম্বাই অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে শাখাকেন্দ্র স্থাপন করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ প্রসারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা তেমন সার্থক হয়নি।

এদিকে ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ, বাংলা দেশের নীলবিদ্রোহ ও অন্যান্য প্রজাবিদ্রোহের ভিতর দিয়ে বিদেশী শাসক ও এদেশীয় শাসিতদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে একটা বৈরভাব জাগ্রত হচ্ছিল। বিচ্ছিন্ন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেতৃত্বহীন ও উদ্দেশ্যহীন হলেও, এই গণআন্দোলনের তরঙ্গ সমাজের বিভিন্ন জনস্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বাঙালী সমাজের

মধ্যস্তরও দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল তখন। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর যেমন উচ্চশিক্ষার বিস্তার হতে থাকে, তেমনি শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরও প্রসার হতে থাকে বাংলা দেশে। অন্যান্য অঞ্চলেও হয়, কিন্তু বাংলা দেশের মতো কোথাও হয়নি। ১৮৫৭ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা উত্তরভারত থেকে বর্মা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) ২০,০০০ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা ১৬,০০০। ১৮৬১ সালে প্রথম এফ এ (ফার্স্ট আর্টস বা ইণ্টারমিডিয়েট) পরীক্ষা প্রচলিত হয়। ১৮৮১ সালের মধ্যে, কুড়ি বছরে, ৫০০০ জন এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাদের মধ্যে বাঙালী ৪০০০ জন। ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে ১৭০০ জন গ্র্যাজুয়েট হয়, তাদের মধ্যে ১৫০০ জন বাঙালী। ১৮৬১ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৪২৩ জন, তাদের মধ্যে ৩৫০ জন বাঙালী। বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রসারের ফলে তাঁদের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের সম্পর্কেরও পরিবর্তন হতে থাকে। মধ্যবিত্তরা এমনিতেই নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থ সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন, তার বাইরে সহজে তাঁদের দৃষ্টি যায় না। কাজেই শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। তার কারণ, ফার্নিভালের ভাষায় 'The diplomas are subject to the law of diminishing returns, which translated into human values, is the law of increasing discontent'. *Educational Progress in South East Asia*) অর্থাৎ ডিপ্লোমা-ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাকরির বাজারে তাঁদের দর যত কমতে থাকল, তত শাসকদের প্রতি তাঁদের বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা বাড়তে লাগল। তাঁরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে থাকলেন। দাবি অনুযায়ী শাসকরা নতুন নতুন চাকরিতে তাঁদের বহাল করতে পারলেন না। ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্গে শাসকদের স্বার্থবিরোধ তীব্রতর হতে থাকল। এদিকে জাতীয় বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্ন সব গণবিদ্রোহের ভিতর দিয়ে শাসক-শাসিতের সম্পর্কে বৈরভাব ব্যাপক হল। এইসময় ১৮৬০ সালের পর থেকে তাই দেখা যায়, জাতীয়তাবোধ ক্রমে সংঘবদ্ধ রূপ ধারণ করছে এবং প্রধানত বাংলা দেশ কেন্দ্র করে।

'হিন্দুমেলা'র অনুষ্ঠান আরম্ভ হল ১৮৬৭ সালের চৈত্রসংক্রান্তি থেকে।

এ বছর তার শতবর্ষ পূর্ণ হল। হিন্দু মেলার আগে রাজনারায়ণ বসু ১৮৬১ সালে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা' স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় কলকাতায় 'স্বাদেশিকের সভা' গঠিত হয়। রাজনারায়ণ বসুর কাছ থেকেই নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলা' অনুষ্ঠানের প্রেরণা পান। এই হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান থেকে আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম একটা নতুন খাতে বইতে আরম্ভ করে। মেলার নামের মধ্যে যে হিন্দুয়ানির গন্ধটুকু আছে, তা শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের হিন্দু প্রাধান্যের জন্য, সাম্প্রদায়িকতাবোধের জন্য নয়। আসলে স্বাদেশিকতাবোধ এইসময় থেকে স্বদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে থাকে এবং তার একটা বলিষ্ঠ শ্যামল দেশী রূপ ধীরে ধীরে প্রকাশ হতে থাকে। 'ন্যাশনাল' ও 'ইণ্ডিয়ান' কথা দুটি যেন বাংলার সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

মেলার লক্ষ্য হয় ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভ এবং সর্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গাও ভারতের জয়' সঙ্গীত গাওয়া হত

মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান ?

হিন্দুমেলার সর্বভারতীয় জাতীয়তার রূপ এই সঙ্গীতের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের ষাট থেকে জাতীয়তাবোধের রূপান্তর হতে থাকে এবং তার সর্বভারতীয় রূপ ক্রমেই স্পষ্টতর হয়। 'হিন্দুমেলা' থেকে এর উৎপত্তি এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় এই সর্বভারতীয় জাতীয়তার একটি বিশেষ প্রকাশ-পর্বের শেষ হয়। যদি বলা যায় যে এই পর্বের, অর্থাৎ জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত জাতীয়তাবোধের এই উদ্‌বোধনপর্বের উদ্‌গাতা ও প্রেরণাদাতা ছিলেন প্রধানত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীরা, তাহলে অত্যুক্তি করা হয় না।

হিন্দুমেলার আহ্বানে একটা সর্বভারতীয়তাবোধের তরঙ্গোচ্ছ্বাস এল যেন বাংলা দেশে। কাব্যে, নাটকে, সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, বিদ্বৎসভার আলোচনায়, সর্বত্র এই অখণ্ড ভারতবোধ, পরাধীনতার বেদনাবোধ এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হতে থাকল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, নাট্যকার মনোমোহন বসু সকলের রচনায় পরাধীন ভারতের বেদনার ঝংকার

শোনা গেল। বাংলা ১২৭৭ সনে হেমচন্দ্রের 'ভারত সঙ্গীত' প্রথম প্রকাশিত হল ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?

এই কবিতা প্রকাশ করার জন্য ভূদেববাবুকে তখন ইংরেজ সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়েছিল। হেমচন্দ্রের এই কবিতা তখন বাঙালীর মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত এবং নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার আলোড়নের সঙ্গে কতকটা তার তুলনা করা চলে। বাঙালীর এই মানসিক আলোড়নের ভিতর দিয়ে একটা বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ভারতবোধের বিকাশ হচ্ছিল, যে-ভারতবোধ আমাদের উদীয়মান নব্যজাতীয়তাবোধের সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিশে গিয়েছে। ভারতবোধ ও জাতীয়তাবোধের এই আত্মিক মিলনপবের ভিতর দিয়ে আমরা উনিশ শতকের সত্তরে পদার্পণ করেছি।

এইসময় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক মঞ্চে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীরূপে আরও অনেকে এলেন, যেমন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন ঘোষ। ১৮৭৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' বা 'ভারত সভা' স্থাপিত হল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে লিখেছেন

> ... the idea that was working in our minds was that the Association was to be the centre of an all-India movement. We accordingly resolved to call the new political body, the Indian Association.
>
> The Indian Association supplied a real need. It soon focussed the public spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of

the educated community of Bengal.

শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থাপিত প্রথম সভা হল ভারতসভা। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে এ বিষয় আরও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি লিখেছেন

> যখন ব্রাহ্মসমাজে এই সকল আন্দোলন চলিতেছে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে—লেখক) তখন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি, তিনজনে আর-এক পরামর্শে ব্যস্ত আছি। আনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক।... যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহনবাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল।

ঠিক হল, ভারত-সভা স্থাপিত হবে এবং বিদ্যাসাগর তার প্রথম সভাপতি হবেন। কিন্তু শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির জন্য বিদ্যাসাগর সভাপতি হতে সম্মত হননি। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে, প্রায় একসময়ে, কিছু আগে ও পরে, অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে আর একটি সভা স্থাপন করেন। এ সভা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ভারতসভার সম্পাদক হলেন আনন্দমোহন বসু, সহকারী সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, প্রথম চাঁদাআদায়কারী সভ্য শিবনাথ শাস্ত্রী। ৯৩নং কলেজ স্ট্রীটে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ভারতসভার কার্যালয় স্থাপন করা হয়। ঘরটির জীর্ণ অবস্থার কথা মনে করে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যে লেখেন 'কড়ি আগে পড়ে কিম্বা দড়ি আগে ছেড়ে'। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, সূর্যকুমার অধিকারী, ভোলানাথ চন্দ্র এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ভারতসভার সভ্য হন।

ভারতসভার সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের বয়সের ব্যবধান বেশি নয়, মাত্র নয়

বছরের। বাঙালীর 'ভারতসভার' স্বাভাবিক পরিণতি ভারতের 'জাতীয় কংগ্রেস', একথা বললে ভুল হয় না। সুরেন্দ্রনাথ-আনন্দমোহনের বাগ্মিতা, কর্মতৎপতা ও ভারত-পর্যটন ভারতসভাকে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি-সভায় পরিণত করল এবং বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তার শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হল। সত্তরে ও আশীতে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' 'ইলবার্ট বিল' প্রভৃতির আন্দোলনের উত্তাপ এত দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে ভারতসভার চাইতে আরও বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব যেন অনিবার্য হয়ে উঠল। এইসময় বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষিত বাঙালীর প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল, হেনরি কটন তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' (১৮৮৫) গ্রন্থে সে সম্বন্ধে লেখেন

> The educated classes are the voice and brain of the country. The Bengalee Baboo now rule public opinion from Peshawar to Chittagong....A quarter of a century ago there was no trace of this; the idea of any Bengalee influence in the Punjab would have been a conception incredible to Lord Lawrence, to a Montgomery, or a Macleod; yet it is the case that during the past year the tour of a Bengalee lecturer, lecturing in English in Upper India, assumed the character of a triumphant progress; and at the present moment the name of Surendra Nath Banerjea excites as much enthusiasm among the rising generation of Multan as in Dacca.

ঢাকা থেকে মুলতান, পেশওয়ার থেকে চট্টগ্রাম বাঙালীর রাজনৈতিক জয়যাত্রা তখন দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে এবং ঘোষণা করছেন প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ, রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অদ্বিতীয় নায়ক। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা তখন বাংলা দেশে যথেষ্ট বেড়েছে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও শিক্ষিতদের ছোটোখাটো গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁদের মুখপাত্র হয়েছেন এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ, দাবিদাওয়া তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। প্রথম দাবি অর্থনৈতিক,

চাকরির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা, সর্বপ্রকার বৈষম্যের বাধা দূর করা। আরও একটি বড় দাবি হল, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের নতুন সামাজিক মান-মর্যাদার দাবি, বিদেশী শাসকরা যা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অন্তত সর্বক্ষেত্রে নয়। তাই নিয়ে বিদেশী শাসক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে একটা বিদ্বেষভাব দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছিল। চল্লিশের 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট' আন্দোলন থেকে আশীর 'ইলবার্ট বিল' আন্দোলন পর্যন্ত এই ধূমায়িত বহ্নির উত্তাপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। চল্লিশ থেকে আশীর মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাও অনেকগুণ বেড়ে যায়। আর্থিক সমস্যা কেবল দেশের সাধারণ লোকের জীবনে নয়, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবনেও বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। ১৮৮১ সালে দেখা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড়হাজার গ্র্যাজুয়েটের মধ্যে অর্ধেকের কাছাকাছি বেকার। এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। ভারতসভার রাজনৈতিক আন্দোলন স্বভাবতঃই তাই অনেক বেশি ব্যাপক ও প্রবল হয়েছিল। তার ভিতর দিয়ে একটা সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হচ্ছিল। তার তাগিদও ভারতসভার বাঙালী নেতারা অনুভব করছিলেন।

একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তার ভিতর দিয়ে ভারতব্যাপী জাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভার তরফ থেকে উদ্‌যোগী হলেন ১৮৮৩ সালে। সভার বিভিন্ন কেন্দ্রের নেতাদের কাছে চিঠি লিখে তিনি একটি 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' স্থাপনের কথা জানালেন। সকলেই উৎসাহিত হয়ে সম্মতি দিলেন এবং ১৮৮৩ সালের ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর তিনদিন ধরে কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে এই জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। প্রথম দিন সভাপতি হলেন রামতনু লাহিড়ী। আনন্দমোহন বসু তাঁর উদ্বোধন ভাষণে বললেন যে ন্যাশনাল পার্লামেন্ট বা জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার এই হল প্রথম পদক্ষেপ। দেশবাসীর প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদ গঠন করা, সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগ পৃথক করা, সর্বপ্রকারের কাজকর্মে অধিক সংখ্যায় যোগ্য ভারতীয়দের নিয়োগ করা, জাতীয় ধনভাণ্ডার স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বার্তা প্রচারের জন্য সুরেন্দ্রনাথ আবার ভারত পর্যটনে বেরিয়ে যান (১৮৮৪ সালে)। এবারে তাঁর বক্তৃতায় বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতবাসীর মনে যে সাড়া জাগে, যে স্বাদেশিকতার প্রেরণায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়, তারই কথা হেনরি কটন তাঁর 'নিউ

ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

এরপর ১৮৮৫ সালের ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে মহাসমারোহে ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয়। এবারের অধিবেশনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন এবং মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান 'সেণ্ট্রাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' যোগদান করেন। আগেকার অধিবেশনে এঁরা কেউ যোগদান করেননি। জাতীয় সম্মেলন সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী 'এ নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে একথা পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন

> The moral transformation which was to usher in the Congress movement had thus already its birth in the bosom of the Indian National Conference which met in Calcutta, and to which representatives from all parts of India were invited.

সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রকৃত জন্ম হয়েছিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনে। ১৮৮৩ সালে যদি না-ও হয়ে থাকে, ১৮৮৫ সালের দ্বিতীয় অধিবেশনে অবশ্যই হয়েছিল বলা যায়। ১৮৮৫ সালের দ্বিতীয় অধিবেশন প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন

> While we were having our National Conference in Calcutta, the Indian National Congress, conceived on the same lines and having the same programme, was holding its first sittings at Bombay. The movements were simultaneous ···

বোম্বাইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন বাঙালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। উমেশচন্দ্র বোম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একই সময়ে কলকাতার ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন ছেড়ে যেতে রাজী হন না। পরবর্তী বত্রিশ তেত্রিশ বছর পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন কেবল এই প্রথম অধিবেশন এবং মধ্যে করাচীর একটি অধিবেশনে ছাড়া। এ-কথা আত্মজীবনীতে সুরেন্দ্রনাথের বিশেষ করে উল্লেখ

করার কারণ হল, বোম্বাইতে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হওয়া ইতিহাসের একটা খেয়ালী ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ কেবল 'কংগ্রেস' নামটি ছাড়া কলকাতার ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশনকালে একই সময়ে বোম্বাই অধিবেশনের কোনো ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক তাৎপর্য কিছু নেই। এ সত্য সেদিনকার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়েছিল বাংলা দেশে কলকাতা শহরে এবং তাতে অবাঙালী দাদাভাই নওরজী সভাপতি হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সঙ্গে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের কোনো তুলনাই হয় না। জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনার পার্থক্য থেকেই বোঝা গিয়েছিল সেদিন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কোথায়—বোম্বাইতে, না বাংলার কলকাতা শহরে। কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় অধিবেশনের বিবরণ দিয়ে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা সেদিন যা লিখেছিলেন, তার খানিকটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি

> জাতীয় সভার সৃষ্টি দিবসে বোম্বাই নগরে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল বটে; কিন্তু জাতীয় সভার দ্বিতীয় বৎসরে কলিকাতার মহানগরীতে যে অপূর্ব দৃশ্য ভারতবাসীর দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, বোম্বাই সভা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই। ভারতবাসী যাহা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, গত ২৬শে ডিসেম্বরের রাত্রি প্রভাত হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন সে স্বপ্ন নহে, প্রকৃত ঘটনা। কলিকাতার রাজপথ ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিতে পরিপূর্ণ, ঘোর কলরবে দিগদিগন্তর প্রকম্পিত; লক্ষ লক্ষ ধনী মানী দীনদরিদ্র, রাজা প্রজায় রাজপথ অবরুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন, শকটে শকটে কলিকাতার বক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আশায় উৎসাহে উৎফুল্ল নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে, প্রাণের আবেগে ভারতবাসী লক্ষ লক্ষ প্রজা কোন্ ঐশীবলে বলীয়ান হইয়া এক যোগে, এক পন্থার পথিক হইয়া যেন কোন অপূর্ব জগতে গমন করিতেছেন। পশ্চাতে কেহ ফিরিয়া দেখেন না, সম্মুখে কেহ কার্যান্তরে মনোনিবেশ করেন না, এক লক্ষ্য, এক উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান মাদ্রাজী মহারাষ্ট্র পার্সী পাঞ্জাবী সকল জাতির প্রতিনিধিগণ বাঙালীর সহিত মিলিত হইয়া জাতীয় সভায় গমন করিতেছেন।
>
> 'সোমপ্রকাশ' ২০ পৌষ ১২৯৩

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার এই বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, কোনো অতিরঞ্জন এর মধ্যে নেই। জাতীয় জনজাগরণের এই দৃশ্য বাস্তবিকই বোম্বাই সভা, সোম-প্রকাশের ভাষায়, স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। তাহলে জাতীয় জাগরণের এই কল্লোল বাংলার কলকাতা শহরে কি এমনিতেই শোনা গিয়েছিল? জাতীয় জাগরণের এই কলরব বাংলা দেশে শোনা গিয়েছিল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে, কারণ হিন্দুমেলা থেকে আরম্ভ করে ভারতসভা, জাতীয় সম্মেলন প্রভৃতির অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে কংগ্রেসের মতো সেদিনকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার পথ বাংলা দেশে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তরাই প্রস্তুত করেছিলেন। একথা ঐতিহাসিক সত্য, বাঙালীত্বের বড়াই নয়।

তারপর কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনের বিচিত্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে যখনই পুরাতন ও নতুন রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল ভাবধারার সংঘাত হয়েছে নীতি ও আদর্শ নিয়ে, তখনই নতুনপন্থী প্রগতিশীল বাঙালীরা আন্দোলনের গতি ও রূপ পরিবর্তন করতে এগিয়ে এসেছেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র-নাথের মতো নেতারাও যখন রক্ষণশীলতার দিকে ঝুঁকেছেন, তখন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষের মতো নবাগতরা তাঁদের বাতিল করতে কুণ্ঠিত হননি। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে যখন স্বরাজ, বিদেশী পণ্য বয়কট, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি আদর্শের আমদানি হল, তখন (১৯০৭-১৯০৯) ভারতের তিনজন নেতা কংগ্রেসের মধ্যে জনপ্রিয় দেশনায়ক হয়ে উঠলেন— মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লজপত রায় বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল 'লাল বাল-পাল' তিনজনের নাম একত্রে ভারতের জনগণের মুখে মুখে তখন উচ্চারিত হত। এঁরা ছিলেন কংগ্রেসের 'এক্সট্রিমিস্ট' বা চরমপন্থী দলের নেতা। এঁদের বিরোধীদের বলা হত 'মডারেট' বা নরমপন্থী। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বকালে প্রথম ও শেষ পর্বে, কংগ্রেসের মধ্যে নতুন-পুরাতনে যে সংঘাত হয়, বাঙালীদের মধ্যে তার প্রথম পর্বের নেতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং শেষ পর্বের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। এইভাবে জাতীয় কংগ্রেসের উৎপত্তিতে যেমন, তার বিকাশ ও অগ্রগতিতে তেমনি বাঙালী রাষ্ট্রনায়করা অগ্রণী হয়েছেন। বাঙালীত্ববোধের চাইতে ভারতবোধ এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধ বরাবরই তাঁদের কাছে মহত্তর আদর্শ বলে গণ্য হয়েছে। প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার বদ্ধকূপে কোনদিনই তাঁরা মণ্ডূকনীতি পালন

করতে পারেননি। এই উদার দেশাত্মবোধের মূল্যও বাঙালীকে কম দিতে হয়নি, আজও দিতে হচ্ছে। কিন্তু মূল্য যতই দিতে হোক, ক্ষতি যতই স্বীকার করতে হোক, বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা সহজেও এই উদারতা ও প্রগতিশীলতার মহান ঐতিহ্য বর্জন করে সংকীর্ণতার বদ্ধগলিতে প্রবেশ করবে বলে মনে হয় না।

১৩৭৪ | ১৯৬৭

গান্ধীবাদের কালোপযোগিতা

ভারতজনের জাতীয়তাবোধের উন্মেষপর্বে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম, ১৮৬৯ সালে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক সুদীর্ঘ পবের প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর জীবনের কীতি বিস্তৃত। আমাদের জাতীয় সংগ্রামক্ষেত্রের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত তাঁরই আহ্বানে প্রথম জনজাগরণের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেছিল, এবং সেই জনকল্লোল যে কুলভাঙ্গা বৈপ্লবিক বন্যায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি, তাও তাঁর কঠোর নৈতিক অনুশাসনের গুণে। জাতীয় আন্দোলনের প্রবাহের দুই তার গান্ধী তাঁর দু'টি নীতির শিলাবন্ধনে এমন নির্মমভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন যে তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস কখনও সেই বন্ধন ভাঙতে পারেনি। এই নীতি দু'টি হল—অহিংসা নীতি ও সত্যাগ্রহ-নীতি। যখনই ভাঙনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই একটি অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করে তিনি তার সক্ষম প্রতিরোধ করেছেন। অস্ত্রটি হল 'আমৃত্যু উপবাসের সংকল্প'। অন্যায়ের জন্য, অসত্যের জন্য অনশন, এবং অনশনের দ্বারা মানসিক শুদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্ত। এ হল ভারতের সনাতন শাস্ত্রীয় বিধান। অহিংসা ও সত্যাগ্রহ, উপবাস ও প্রার্থনা—এই ছিল গান্ধীর জাতীয় সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার—এবং তাঁর নিজের জীবনদর্শনের গ্র্যানিট্ ভিত্তিস্তম্ভ। এই হাতিয়ার প্রয়োগ করেই অবশ্য তিনি ভারতের জাতীয় জীবনে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি অদ্বিতীয় ও একক। গান্ধীর চেহারা ও সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করে ফরাসী মনীষী

রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন

> This is the man who has stirred three hundred millions to revolt, who has shaken the foundations of the British Empire and *who has introduced into human politics* the strongest religious impetus of the last two thousand years. (Italics লেখকের)

গান্ধী সম্বন্ধে রোমাঁ রোলাঁর এই উক্তির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল এই—'যিনি মানুষের রাজনীতিকে গত দুহাজার বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ধর্মীয় প্রেরণায় উজ্জীবিত করেছিলেন।' গান্ধীরাজনীতির এইটাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মের যে প্রেরণা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে সঞ্চার করেছিলেন তা তাঁর নিজস্ব কোনো মৌল দান নয়, অথবা তার মধ্যে অভিনবত্বও কিছু নেই। এমনকি ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপনও তাঁর কৃতিত্ব নয়। আমরা জানি, ভারতে জাতীয়তাবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয়েছিল উনিশ শতকে, প্রায় গান্ধীর জন্মকালে, মূলত ধর্মীয় প্রেরণা থেকে। বাংলা দেশই ছিল তখন এই জাতীয় জাগরণের প্রাণকেন্দ্র। জাতীয়তার অন্যতম দীক্ষাগুরু রাজনারায়ণ বসু যে জাতীয় গৌরবসঞ্চারিণী সভা ও স্বাদেশিকের সভা স্থাপন করেছিলেন, নবগোপাল তথা 'ন্যাশনাল' মিত্র যে 'হিন্দুমেলার' প্রবর্তন করেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ মৃতপ্রায় জাতিকে পুনর্জীবনদানের জন্য ধর্মের যে সঞ্জীবনী বাণী প্রচার করেছিলেন, এবং স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবল জোয়ার বয়ে গিয়েছিল দেশে—তার প্রত্যেকটির মধ্যে ধর্মের সুর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয়েছিল, এবং এই ধর্মের সুর হিন্দুধর্মের গৌরবময় প্রাচীন ঐতিহ্যের সুর। হিন্দুধর্মের এই পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় জাগরণের সঙ্গমের অবশ্যম্ভাবী ফল যে হিন্দু-মুসলমানের জাতীয়তাবোধের সমান্তরাল বিচ্ছিন্নতা, সে-কথাও অস্বীকার করার অর্থ হল ইতিহাস বিকৃত করা। গান্ধী তাঁর জীবন উৎসর্গ করেও এই দ্বিখণ্ডিত জাতীয়তাবোধকে অখণ্ড রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, এবং ভারত খণ্ডিত হয়েছে। এই ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতা, যার গ্লানি ও অভিশাপ হয়ত পুরুষানুক্রমে আমাদের বহন করতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গান্ধী তাঁর পূর্বসূরীদের ধারা অক্ষুণ্ণ রেখেই রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং জাতীয় সংগ্রামে যে ধর্মাদর্শের প্রতি তিনি জনসাধারণের

আনুগত্য দাবি করেছিলেন তা নতুন নয়, অন্তত দুহাজার বছরের প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট অশোকের সময় থেকে যুগে যুগে ভারতে ধর্মপ্রবর্তকদের কণ্ঠে অহিংসা ও সত্যের বাণী প্রচারিত হয়েছে। গান্ধী এই প্রাচীন ধর্মীয় আদর্শকে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন, এইটাই তাঁর ঐতিহাসিক কীর্তি। জাতীয়তা-বোধের উদ্‌বোধনকালে ধর্মপ্রেরণা যে জাতীয়-চৈতন্যের বিকাশে সহায় হয়েছিল, তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে প্রসৃত হয়নি। তৎকালে যাঁরা এই প্রেরণার মুখপাত্র ছিলেন তাঁরা রাজনীতিক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত আচরণে অথবা জীবনযাত্রায় কোনো ধর্মাদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দেননি। গান্ধীর সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য এইখানে। গান্ধী যে ভারতের জাতীয় জনসংগ্রামের প্রথম সার্থক অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন তার কারণ ধর্মের শক্তিকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন যা আগে কেউ করেননি—এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে তার 'মডেল' বা প্রতিমূর্তিরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনযাত্রা, কথাবার্তা, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান—সব কিছুর ভিতর দিয়ে তিনি ভারতের জনসাধারণের সামনে নতুন-ধর্মসংস্থাপকরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন, যে-ধর্ম রাজনৈতিক ধর্ম। জনসমর্থন পেলে ধর্মের শক্তিকে যে কত ব্যাপক রাজনৈতিক আলোড়নের হাতিয়ারে পরিণত করা যায়, তার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন পর্বে গান্ধীর 'অসহযোগ' ও 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন।

মহাত্মা গান্ধীর এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপ কি? অধ্যাপক গিলবার্ট মারি (Gilbert Murray) গান্ধীর এই ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন

> His patriotism....is interwoven with his religion, and aims at the moral regeneration of India on the lines of the Indian thought....Oriental people, perhaps owing to causes connected with their form of civilization, are apt to be enormously influenced by great saintliness of character when they see it. Like all great masses of ignorant people, however, they need some very plain and simple test to assure them that their hero is really a saint....and the test they habitually apply is that of self-denied,

মারির উক্তির সমর্থন শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর এই কথাতেও পাওয়া যায়

> In fact it is ..his realisation of a 'sannyasin' in all the rigour of its Eastern conception, which accounts for the great hold he has over the masses of India and has crowned him with the title of Mahatma,

ভারতের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শে গান্ধী নিজের জীবন রূপায়িত করেছিলেন, অথচ সন্ন্যাসধর্ম প্রচার করা তাঁর কাজ ছিল না, জাতীয়তাবোধের প্রসারণই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। কাজেই রাজনৈতিক স্বার্থে যদি তিনি ত্যাগী সন্ন্যাসীর মডেলে নিজের জীবনকে গড়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে ভারতজনচিত্তের মৌল উপাদান সম্বন্ধে তাঁর চেতনা অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি জানতেন যে রাজনীতির চারিদিকে ধর্মের ইন্দ্রজাল রচনা করতে না পারলে, দেশেব বিশাল জনসমাজের মনে সাড়া জাগানো সম্ভব হবে না। এ-সত্য গান্ধীর আগে—এবং বোধ হয় সর্বপ্রথম আমাদের দেশে, স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে স্বামী বিবেকানন্দ যদি প্রত্যক্ষ রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন, তাহলে গান্ধীর রাজনৈতিক আবির্ভাব সম্ভব হত কি না, এবং হলেও তাঁর আদর্শের প্রভাব ভারতের জনসমাজে কতদূর বিস্তৃত হত তা ভাববার বিষয়। উনিশ শতকের শেষদিকে স্বামী বিবেকানন্দ গান্ধীর আবির্ভাবের পথ সুগম ও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।

গান্ধীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে বলা যায়, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনিই প্রথম সার্থক 'charismatic leader'. 'Charisma' কথার অর্থ হল 'gift of grace'– বাংলা ভাষায় অলৌকিক শক্তি বা 'বিভূতি' বলা যায়। মানবেতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর বড় বড় ধর্মপ্রবর্তক, ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনায়ক ও রণনায়করা হলেন এই 'charismatic authority'-র সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। বিখ্যাত জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স্ হেবার (Max Weber) তাঁর *Power* গ্রন্থে 'The Sociology of Charismatic Authority' প্রসঙ্গে বলেছেন যে এই বিভূতিময় বা অলৌকিক শক্তিশালী নায়কদের শক্তির উৎস হল আত্মসংযম, অনুগামীদের অন্যায়ের জন্য আত্মনিগ্রহ, অনুরাগীদের প্রশ্নাতীত বাধ্যতা, এবং নিজের পন্থাকে ঈশ্বরের আদিষ্ট পন্থা বলে মনে করা। বিভূতিশালী মহাপুরুষদের বিভূতির জ্যোতি লোকচক্ষে দীপ্যমান রাখার জন্য কতকগুলি টেকনিক বা

কৌশলও অবলম্বন করতে হয়। গান্ধীর টেকনিক ছিল—সত্যাগ্রহ, অহিংসা, উপবাস, প্রার্থনা ও আশ্রম। জাতীয় সংগ্রামের পর্বে পর্বে এই কৌশলে জন-বিক্ষোভ উদ্দীপন ও নিয়ন্ত্রণের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'charisma' বা বিভূতির জ্যোতি ক্রমে লোকমানসে উজ্জ্বলতর হয়েছে। কিন্তু 'charisma' বা দিব্যজ্যোতির আকর্ষণ, অন্তত রাজনীতিক্ষেত্রে, বর্তমান ভারতে যে নিশ্চিত অস্তগামী তাতে সন্দেহ নেই।* গত ২০-২৫ বছরের মধ্যে ভারতের জনসমাজে গণতান্ত্রিক ব্যক্তিচেতনা, গোষ্ঠীচেতনা ও সংঘচেতনার এমন ব্যাপক বিস্তার হয়েছে যে ধর্মের ক্ষেত্রে আজও বহু ধর্মাবতারের অস্তিত্ব থাকলেও, রাজনীতিক্ষেত্রে কোনো ছদ্মবেশী ধর্মাবতারের পক্ষে চারিত্রিক দিব্যজ্যোতির মহিমায় 'miracle' ঘটানো সম্ভব নয়। কোনো রাষ্ট্রনেতার পক্ষে আজকের ভারতে উপবাস ও প্রার্থনা করে নিজের ইচ্ছামত গণ-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করার কথা ভাবা যায় না। এ-ছাড়া গান্ধী তাঁর নিজের জীবনেই রাজনীতিতে অহিংসানীতির যথেষ্ট ব্যর্থতা দেখেছেন। কিন্তু বর্তমান ভারতে যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে ভারতের পথ ঘাট-বাজার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন অঞ্চল, প্রদেশ, বিদ্যায়তন, অফিস, কলকারখানা সর্বত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে হিংসাত্মক হানাহানির সর্বাত্মক প্রকাশ দেখে নিশ্চয় তিনি পাগল হয়ে যেতেন। মর্মে মর্মে বুঝতে পারতেন যে অহিংসার আদর্শ সম্রাট অশোকের মতো শিলাগাত্রে খোদাই করে প্রচার করলে, অথবা উপর থেকে নিচের জীবন্ত ও ক্ষুব্ধ জনসমাজের উপর আরোপ করতে চাইলে তা এমনিভাবেই ব্যর্থ হয়, এবং অনুকূল সামাজিক ও মানবিক পরিবেশের মূল থেকে উৎসারিত না হলে কখনও তার সার্থকতার সম্ভাবনা থাকে না। অতএব গান্ধীর 'charismatic authority' বা তার সংশ্লিষ্ট কলাকৌশল, অথবা তাঁর বিমূর্ত অহিংসানীতি বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে anachronistic বা কালবিরুদ্ধ বলে মনে হয়।

গান্ধীর জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছবি তাঁর সমাজদর্শন। তাঁর জীবনদর্শন যেমন ঐতিহাসিক ধারার উজানমুখী, তাঁর সমাজদর্শনও তেমনি প্রবহমান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। আধুনিক সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে গান্ধীর মতামতের সুস্পষ্ট পরিচয়

* এখনও 'ব্যক্তির' দিব্যজ্যোতির আকর্ষণ ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। —লেখক, ১৯৭৮

পাওয়া যায় ১৯০৯ সালে লেখা তাঁর 'হিন্দ স্বরাজ' রচনায়। তিনি বলেন: 'ব্রিটিশ শাসকরা যে ভারতবর্ষ শাসন করছে তা নয়, আসলে শাসন করছে আধুনিক সভ্যতা। এই আধুনিক সভ্যতা তার রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এবং নানা-রকমের আবিষ্কার ও কলাকৌশল দিয়ে দেশটাকে বেঁধে ফেলেছে। বোম্বাই, কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহর হল এই সভ্যতাব্যাধির প্রধান বীজাণুকেন্দ্র। যদি এই সভ্যতার উপাদানগুলি সব থাকে এবং ব্রিটিশ শাসকরা ভারত ছেড়ে চলে যান, তাতে ভারতের কোনো পরিবর্তন বা উন্নতি হবে না, কিঞ্চিৎ আর্থিক লাভ ছাড়া। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান হল এক ধরনের black magic, তার চেয়ে আমাদের দেশীয় হাতুড়ে চিকিৎসা অনেক ভাল।' অতএব গান্ধী মনে করেন

> India's salvation consists in unlearning what she has learnt during the past fifty years or so. The railways, telegraphs, hospitals, lawyers, doctors and such like have all to go.

১৯০৯ সালে গান্ধী যখন এই অভিমত প্রকাশ করেন তখন তাঁর বয়স ৪০ বছর। বেশ পরিণত বয়স বলা চলে। অথচ ভাগ্যবান গান্ধী ইংলণ্ডে যাবার সুযোগ পান মাত্র ১৯ বছর বয়সে, ১৮৮৮ সালে। ১৮৯১ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ডে থেকে ২২ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পাস করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ইংলণ্ডের সামাজিক ও মানবিক পরিবেশ তখন কিরকম ছিল? গান্ধী ইংলণ্ডে পৌছবার আগের বছর—১৮৮৭ সালে—কার্ল মার্কস্-এর *Capital* মহাগ্রন্থের ইংরেজি সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়, Labour Party গঠিত হয়। Fabian Society এইসময় সোশ্যালিজমের আদর্শ প্রচার করতে থাকে। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত ডারুইনের *Descent of Man* মহাগ্রন্থ চিন্তারাজ্যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই প্রগতিশীল চিন্তাধারার পাশাপাশি দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক অগ্রগতিতে বীতশ্রদ্ধ উইলিয়ম মরিস, জন রাস্কিন প্রমুখ মনীষীদের অতীতে প্রত্যাবর্তনের চিন্তাধারা। এ-কথা ঠিক যে শিল্পবিপ্লবের পর দ্রুতগতিতে ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের কোনো-কোনো দেশের শিল্পনগর, শহর, মহানগর ক্রমেই নিসর্গ বিকৃত করে একটা শ্রীহীন যান্ত্রিক রূপ ধারণ করছিল এবং মানুষের মনের চেহারাও কতকটা যন্ত্রের ধাঁচে গড়ে উঠছিল। এই পরিবেশ প্রসঙ্গে ট্রেভেলিয়ান তাঁর *English Social History* গ্রন্থে লিখেছেন

'To millions the divorce from nature was absolute, and so too was the divorce from all dignity and beauty........ the stage was set for the gradual standardisation of human personality.

রাস্কিন ও মরিস তাই **'back to nature'**-এর বাণী প্রচার করেছিলেন। রাস্কিনের ***Unto this Last*** ও ***Fors Clavigera*** গ্রন্থে এই **'back to Nature'**-এর জীবনাদর্শই ঘোষিত হয়েছে।

লক্ষণীয় হল, এই পরিবেশে—এবং যৌবনের প্রারম্ভে—গান্ধীর মানসিক প্রবণতা। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম হল অগ্রগামিতা, এবং সাধারণত দিক্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য অগ্রগামিতা। কিন্তু গান্ধীর জীবনে এই স্বাভাবিক ধর্মের বিকাশ দেখা যায় না। ইংলণ্ডে যখন ডারুইন, কার্ল মার্ক্‌স, ওয়েন ও অন্যান্য মনীষীদের প্রচারিত আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতে চিন্তাজগতে একটা বৈপ্লবিক আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল, সুশিক্ষিত যুবক গান্ধী তখন কারখানার চিমনির ও ষ্টীম ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর দৃষ্টি অতীতের প্রত্যক্ষ প্রকৃতিনির্ভর জীবনের দিকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। ধোঁয়ার আস্তরণ ভেদ করে তাঁর দৃষ্টি অগ্রগামী ইতিহাসের দিগন্তবিসর্পী পথে প্রসারিত হয়নি। মরিস-রাস্কিন-তলস্তয় প্রমুখ মনীষীদের 'দাও ফিরে সেই অরণ্য—সেই তপোবন' আদর্শ তাঁকে অভিভূত করেছিল। এবং ভারতের মাটিতে 'ফিউডাল' বা সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের এত প্রাচুর্য ছিল গান্ধীমতের অভ্যুদয়কালে—যে এই আদর্শের বীজ ছড়িয়ে সুফল লাভ করতে তাঁর কষ্ট হয়নি।

অনেক মনীষীর চিন্তাধারা অনুশীলন করলে দেখা যায় যে জীবনের গতিপথে পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিবেশের আবর্তে তাঁদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ও বিকাশ হয়েছে, কিন্তু গান্ধীচিন্তায় সেরকম বিশেষ কিছু দেখা যায় না। যৌবনের প্রারম্ভে ২০-২২ বছর বয়সে যে সমাজচিন্তার অনুগামী তিনি হয়েছিলেন, সারাজীবন স্থিরদৃষ্টিতে সেই চিন্তারই পশ্চাদ্‌ধাবন করেছিলেন। এতে তাঁর সাধকসুলভ একাগ্রতা, নিষ্ঠার ও সততার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মানসিক সজাগতা ও গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বহমান সমাজে গান্ধী বদ্ধচিন্তার হাল ধরে চলেছিলেন। ১৯০৯ সালে ৪০ বছর বয়সে গান্ধী 'হিন্দ স্বরাজ'-এ যে রামরাজ্যের আদর্শ ধ্যান করেছিলেন, ৭০ বছর বয়সেও দেখা যায়

তিনি তা বদলাননি। ১৯৩৯ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লেখেন

> God forbid that India should ever take to industrialism after the manner of the West. (28 January, 1939)

জীবনের বাকি নয় বছরেও তাঁর এই মতের পবিবর্তন হয়নি। প্রথম মহাযুদ্ধে রুশবিপ্লব ও তার পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর জাগরণ গান্ধীর মনে বিভীষিকার সঞ্চার করেছিল, কোনো নতুন আশা বা প্রেরণা সঞ্চার করেনি। ১৯২১ সালেই তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন—'India does not want communism.' ১৯২৪ সালে রুশবিপ্লব সম্বন্ধে তিনি বলেন

> I do not know whether it is for the good of Russia in the long run. But I do know that in so far as it is based on violence and denial of God, it repels me.

শোনা যায় কারাজীবনে গান্ধী একবার মার্কসের *Capital* গ্রন্থ পাঠ করে মন্তব্য করেন

> I think I could have written it better, assuming of course, that I had the leisure for the study he has put in.

যদি তাঁর বই পড়ার পর্যাপ্ত অবকাশ থাকত তাহলে, গান্ধীর ধারণা ছিল, তিনি মার্কসের *Capital*-এর চেয়ে আরও অনেক ভাল গ্রন্থ লিখতে পারতেন। গান্ধীর বিদ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা বজায় রেখেও বলা যায়—তাঁর এই উক্তি যুক্তিহীন এবং হয়ত তাঁর শিশুসুলভ সারল্যের প্রকাশ। অনেক পণ্ডিতের রচনায় মার্কসের চেয়ে অনেক বেশি পাণ্ডিত্য ও অধীত-বিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য ইতিহাসে তাঁরা কেউ মার্কসের সমকক্ষ অথবা সগোত্র বলে স্বীকৃতি পাননি। আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব-চিন্তার সুদীর্ঘ পথের উপর তিনটি কি চারটি বাঁক দেখা যায়, তার সর্বশেষ বাঁকটিতে মার্কসের স্থান। গান্ধী শুধু মার্কসের বাইরের খোলসটুকু দেখেছিলেন. তার ভিতরের সারটুকু দেখতে পাননি। তার কারণ, আগেই বলেছি, গান্ধীর ধারণা ছিল সমাজগতি কতকগুলি বদ্ধমূল অচল-অটল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজগতির পরিবর্তনশীলতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই সুদূর অতীতের

সত্যযুগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অতীতে প্রত্যাবর্তনের আকুতি তাঁর জীবনে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মানবজীবনে যেমন অতিক্রান্ত বয়সে আর ফিরে যাওয়া যায় না, তেমনি সমাজজীবনেও অতিক্রান্ত কালে প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। এই কালবিরুদ্ধতার জন্য গান্ধীর সামাজিক আদর্শ অচল বলে মনে হয়।

অচল নীতি দিয়ে সচল সমাজের সমস্যা সমাধান করা যায় না। তাই মহাত্মা গান্ধীর কোনো নীতি আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না। গান্ধী বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রেণীবৈষম্য বাস্তব সত্য হিসাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কিন্তু বিরোধের মধ্যে হিংসা আছে বলে শ্রেণীবিরোধ স্বীকার করতে পারেননি। তিনি ভাবতেন, হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে শ্রেণীবিরোধের অবসান ঘটানো যায় যুক্তিটা কতকটা এইরকম : জমিদাররা ও শিল্পপতিরা যদি প্রজাদের ও শ্রমিকদের ভালবাসে এবং প্রজারা ও শ্রমিকরাও যদি তার প্রতিদান দেয়, তাহলে শ্রেণী-বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে না। ১৯৪৫ সালে, মৃত্যুর কয়েকবছর আগেও গান্ধী তাঁর Constructive Programme-এ বলেন

> A violent and bloody revolution is a certainty one day unless there is a voluntary abdication of riches and the power that riches give, and sharing them for the common good.

কিন্তু অর্থ ও অর্থাশ্রিত ক্ষমতার স্বার্থ স্বেচ্ছায় কেউ ত্যাগ করছেন বলে জানা যায়নি। ল্যুই ফিশার লিখেছেন : 'No report of 'voluntary abdication' by a landlord or mill-owner reached Gandhi before the day of his death.'

তা সত্ত্বেও শ্রেণীসংগ্রাম গান্ধীর কাছে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ছিল। Class collaboration বা শ্রেণী-সহযোগিতার নীতিতে তাঁর আস্থা ছিল অটল। ধনবৈষম্য সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব, একথাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। ১৯৩৭ সালে 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি লেখেন

> Even in the most perfect world, we shall fail to avoid inequalities, but we can and must avoid strife and bitterness. There are numerous examples extant of

the rich and the poor living in perfect friendliness. We have but to multiply such instances. (2 January, 1937)

ধনী-নির্ধনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে দৃষ্টান্তের কথা গান্ধী এখানে উল্লেখ করেছেন তা 'ফিউডাল' সমাজের দৃষ্টান্ত—যখন রাজা-মহারাজাদের 'benevolent despotism'-এর মধ্যে মানবিক সম্পর্কের সূত্র খুঁজে পাওয়া যেত এবং মানুষ বাইরের প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে জীবনের অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করত। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষ নিজের জীবন থেকে কর্ম থেকে ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হল বাজারের পণ্যের সম্পর্ক। কাজেই 'হৃদয়' নামে পদার্থটি ক্যাপিটালিস্ট সমাজের প্রথম casualty এবং কাব্য-কল্পনালোকের 'হৃদয়' ধনতান্ত্রিক যন্ত্রলোকে কেবল অ্যানাটমির 'হৃদ্‌যন্ত্র' ছাড়া কিছু নয়। Frich Fromm তাঁর *The Sane Society* গ্রন্থে love বা ভালবাসা সম্বন্ধে বলেছেন: 'Love is one aspect of productive orientation : the active and creative relatedness of man to his fellow man, to himself and to nature.'

মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে তার নিজের ও বাইরের প্রকৃতির সৃজনী সংযোগবোধ থেকে ভালবাসার বিকাশ হয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই সংযোগবোধ ছিন্ন হয়ে যায়, ভালবাসার মূল যায় শুকিয়ে এবং তার অস্বাভাবিক বিকৃতি ও ব্যভিচারের পথ ক্রমে প্রশস্ত হয়। সেইজন্য শ্রেণীসহযোগিতার সপক্ষে গান্ধী 'change of heart'-এর জন্য যে আবেদন করেছিলেন জমিদার ও কৃষক, মালিক ও শ্রমিকদের কাছে, সেই আবেদন 'হৃদয়ে' নয়, 'হৃদ্‌যন্ত্রে' প্রতিহত হয়ে ব্যর্থতার শূন্যতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আজকের ভারতে এই প্রতিধ্বনির প্রচণ্ড শব্দে গান্ধীর শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ত বিকল হয়ে যেত এবং তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেও মনে মনে বুঝতে পারতেন বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তাঁর হৃদয়নির্ভর শ্রেণীসহযোগিতার নীতির মারাত্মক গলদ কোথায়।

গান্ধীচিন্তার একটা ক্রমিক বিকাশ শুধু হিন্দুসমাজের জাতিবর্ণভেদ বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০-২১ সালে, প্রায় ৫১-৫২ বছর বয়সেও দেখা যায়—গান্ধী হিন্দুসমাজের সনাতন চাতুর্বর্ণ্যের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। 'Young India' পত্রিকায় তখন তিনি লিখেছেন: 'I consider the four divisions to be

fundamental, natural and essential.' (1920) 'Prohibition against intermarriage and interdining is essential for the rapid evolution of the soul.'

জাতিবর্ণভেদ সম্বন্ধে গান্ধীর এই মতের কালিক গুরুত্ব গভীর। রাজনীতি-ক্ষেত্রে যখন তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন এবং অসহযোগনীতির প্রস্তুতিপর্বে ব্যস্ত, তখনও—যথেষ্ট পরিণত বয়সেও তাঁর বিশ্বাস ছিল—হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ আবশ্যিক এবং বিভিন্ন জাতিবর্ণের মধ্যে আহারবিহার ও বিবাহ নিষিদ্ধ থাকা আত্মার অভিব্যক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ৫২ বছর বয়সেও যাঁর সামাজিক দৃষ্টি প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যসভ্যতার সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি এবং বিংশ শতকের প্রথম পর্বেও—তাঁর সমাজচিন্তার আসল 'কঙ্কালটি যে কি তা বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না। যাই হোক, পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে গান্ধী জাতিবর্ণভেদ সম্বন্ধে তাঁর মত পরিবর্তন করেন। ১৯৩২ সালে তিনি বলেন : **'Restriction on intercaste dining and intercaste marriage is no part of the Hindu religion. It crept into Hinduism when perhaps it was in its decline.' (4 November, 1932)** দশ বছরের মধ্যে মতের আমূল পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৪৬ সালে তিনি লেখেন : **'I therefore tell all boys and girls who want to marry that they cannot be married at Sewagram Ashram unless one of the parties is a Harijan.' (*Hindusthan Standard,* 5 January, 1946)**

মতের পরিবর্তন নয় শুধু, তার দৃঢ়তাও লক্ষণীয়। কিন্তু প্রশ্ন হল সেবাগ্রাম আশ্রমে, অথবা অন্য যেকোন আশ্রমের গণ্ডির মধ্যে, শুধু অসবর্ণ বিবাহ মঞ্জুর করলে, অথবা আহারবিহারের বর্ণগত নিষেধ উপেক্ষা করলেই কি সমাজ থেকে জাতিবর্ণের সংস্কার দূর হতে পারে ? তা যদি হত তাহলে বহুকাল আগেই ভারতীয় সাধক ও সমাজসংস্কারকদের জাতিবর্ণসাম্যের আহ্বানে এই বৈষম্যের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বুঝতে হবে, কেবল একটা নিরবয়ব আদর্শের মাহাত্ম্য প্রচার করলেই ভারতীয় হিন্দুসমাজের জাতি-বর্ণ-বৈষম্যবোধ দূর হতে পারে না। তার জন্য আরও গভীরতর মূলে প্রবেশ করা প্রয়োজন। বর্তমান ভারতের রাজনীতিতে দেখা যায়—এবং এবিষয়ে ভারতের

বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানও অনেক হয়েছে—যে ক্রমে আমাদের দেশে 'casteism' বা জাতিবর্ণবাদের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হচ্ছে। গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তারের ফলে বিভিন্ন জাতি-বর্ণের আত্মনিয়ন্ত্রণের চেতনা যত বিস্তৃত হচ্ছে, তত আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ থেকে জাতিবর্ণবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। কাজেই গান্ধীর অসবর্ণ বিবাহ, অস্পৃশ্যতাবর্জন প্রভৃতি আদর্শ আশ্রমিক নীতিকথার মতো প্রচার করলে জাতিবর্ণসাম্য ভারতীয় সমাজে বাস্তব সত্যে রূপায়িত হবে না। তার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—গান্ধীনীতি ও গান্ধী-অনুসৃত সামাজিক আদর্শ অধিকাংশই বর্তমান কালোপযোগী নয়, কালবিরুদ্ধ। গান্ধী ছিলেন মূলত 'charismatic personality'—ভারতীয় সাধুসন্তদের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভূতিতে ভারতের জনসাধারণ আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশি এবং সেইকারণেই একদা রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি সার্থক জননেতা হতে পেরেছিলেন। তাঁর এই বিভূতিময় আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কথা ভারতের মানুষ—এমনকি পৃথিবীর মানুষ—শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করবে, কিন্তু তাঁর ইতিহাসবোধ ও সামাজিক গতিবোধ সত্য বলে স্বীকার করতে পারবে না, এবং সেই বোধসম্ভূত প্রত্যয় ও নীতিগুলিকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতেও পারবে না।

১৯৬৮

মধ্যবিত্তশ্রেণী ও মাধ্যমিক সংঘ

একথা আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে আমরা এক অতিদ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে বাস করছি। পরিবর্তনের দ্রুততা এত প্রখর যে তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলাই মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজকের ধ্যানধারণা কালকে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে আজকের ভালমন্দ বিচারের মানদণ্ড কালকে বদলাতে হচ্ছে। বদ্ধ জলে লগি ঠেলে নৌকা বাইতে আমরা অভ্যস্ত, স্বভাবতই তাই প্রবল খরস্রোতে হাল ধরে রাখাই সম্ভব হচ্ছে না। আগেকার কোনযুগের সঙ্গে এযুগের এই বেগবান জীবনের তুলনা করা চলে না। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ, সকলেই একবাক্যে বলবেন, বৈজ্ঞানিক প্রগতি। অন্যভাষায় এই বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে বলা যায়, সমাজের কাজের জন্য প্রাকৃতিক শক্তির পরিপূর্ণ মুক্তি ও প্রয়োগ। প্রাকৃতিক শক্তির এই মুক্তির সঙ্গে আরও অনেক শক্তির মুক্তি ঘটেছে। তাদের 'সামাজিক শক্তি' বলা যায়। প্রাকৃতিক শক্তি (natural forces) এবং সামাজিক শক্তি (social forces), দুয়েরই মুক্তির ফলে, জীবনের ধারার ও গতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রকৃতির স্তরে স্তরে যে-শক্তি এতকাল গোপন ছিল শুধু যে তাকেই আমরা মুক্ত করেছি তা নয়, সমাজের স্তরে স্তরে যে শক্তি চিরকাল উপেক্ষিত ছিল, তাকেও আমরা আজ মুক্ত করেছি, জাগিয়ে তুলেছি। সেই শক্তি হল সমাজের গণতান্ত্রিক শক্তি। এই গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপকতা ও গভীরতা সম্বন্ধে এতদিন আমাদের সম্যক ধারণা ছিল না। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গোষ্ঠী-স্বাধীনতার

ভিত্তির উপর গণতান্ত্রিক সমাজের সৌধ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা, দেশ-ভেদে দু'চার শতাব্দী আগে, আধুনিক বিজ্ঞানের শুভযাত্রা শুরু হওয়ার দিনে। তারপর ইতিহাসের কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত দুর্যোগ, কত চড়াই-উত্‌রাই পার হয়ে, প্রকৃত গণতন্ত্রের সেই শক্তিকে আজ আমরা আয়ত্তে এনেছি এবং তার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেছি। এই গণতান্ত্রিক শক্তির উৎস কোথায়? উৎস হল সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক মানুষ। সমাজে আজ প্রত্যেক ব্যক্তির শক্তি অবাধ মুক্তি পেয়েছে, তার বন্ধনহীন স্ফূর্তির সুযোগ এসেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরমাণুর অন্তর্নিহিত গোপন শক্তির বিকাশ দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি। কারণ তার বাহ্যপ্রকাশ বা **demonstration**-এর আড়ম্বর খুব বেশি, তাই আমাদের চোখ ও মন তাতে ধাঁধিয়ে যায়। সমাজে ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর শক্তি প্রকাশেরও একটা বাহ্য দিক আছে, সেটাও কম জমকাল নয়। কিন্তু সেটা আমাদের স্পুৎনিক বা হাইড্রোজেন-বোমার মতো নজরে পড়ে না। অথচ প্রকৃতির অ্যাটমের মতো সমাজের অ্যাটম যে ব্যক্তি ও মানুষ তার শক্তিও কম প্রচণ্ড নয়। সেই ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিও আজ মুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সমাজের পরমাণু-শক্তিও আজ জেগেছে। গণতন্ত্রের আদর্শ দীর্ঘকালের সংগ্রামের পরে, আজ সার্থক হতে চলেছে।

সেই কারণেই আজ সমাজের রূপ বদলে গেছে এবং প্রতিদিন বদলাচ্ছে। সে বিরাট সামাজিক শক্তিকে আজ আমরা জাগিয়ে তুলেছি, তার বহুমুখী বিচিত্র প্রকাশ দেখে আমরা নিজেরাই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সেই শক্তিকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিভাবে তার বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায়, আজও তার কলাকৌশল আমরা উদ্ভাবন করতে পারিনি। পরমাণুর প্রচণ্ড শক্তিকে যেমন আমরা ব্যাপক ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারি, আবার মানুষের কল্পনাতীত কল্যাণের কাজেও নিয়োগ করতে পারি, তেমনি ব্যক্তির এই আত্মশক্তির প্রখর চেতনাকে, অর্থাৎ বন্ধনহীন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে, আমরা সমাজের বিকলন বা **disintegration**, অথবা সমাজের নবরূপায়ণ বা **re-integration**-এর জন্য নিয়োগ করতে পারি। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, অথবা প্রত্যেক সংঘ বা গোষ্ঠী (**groups and associations**), আজ যদি কেবল আত্মশক্তির **demonstration**-এর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তাহলে সমস্ত ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর শক্তির অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের মধ্যে সমাজটা একটা

কুরুক্ষেত্রে পরিণত হবে, এবং সেই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ধর্মাবতার এক ডিক্টেটরের অবতীর্ণ হতেও বিলম্ব হবে না। সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ারের মধ্যে সশব্দে সামরিক কুচকাওয়াজ করে ডিক্টেটর-অবতার এসে তখন বলবেন : 'হে অমৃতের পুত্ররা ! ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য তোমরা লড়াই করেছিলে, সে-স্বাধীনতা তোমরা পেয়েছিলে, কিন্তু তার মর্যাদা তোমরা রাখতে পারনি। তার অপব্যবহার করতে তোমরা দ্বিধা করনি। তাতে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, স্বাধীনতার কথা ভুলে গিয়ে আমার আদেশ পালন কর, আমাকে অনুসরণ কর।' গভীর হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে আমরাই তখন তাঁকে saviour বলে মেনে নেব, এবং বিনা দ্বিধায় সমস্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হব না। সমাজের দ্রুত পরিবর্তন ও ব্যাপক ভাঙনের রূপ দেখে সম্প্রতি একদল দার্শনিক এই ভয়াবহ সুর তুলেছেন, এবং মিলিটারি অবতারের মোহে আকৃষ্ট হয়ে উঠেছেন। সমাজের ভাঙনটাই তাঁদের কাছে বড় সত্য হয়ে উঠেছে।

একথা অবশ্য ঠিক যে সমাজের ভাঙনের দৃশ্য আজ এত ব্যাপকভাবে প্রকট, নীতি শিক্ষা সংস্কৃতি মানবিক সম্পর্ক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে, যে কেবল সেইদিকে চেয়ে দেখলে আশা ভরসার কোনো বন্দরই কোথাও নজরে পড়ে না। কিন্তু সেটা যত ভয়াবহ দিকই হোক, সেটা একটা দিক মাত্র। সমাজের নতুন গড়নেরও একটা দিক আছে, তার দিকেও চেয়ে দেখা দরকার। যে-নদীর গতি মন্থর, তার তীর-ভাঙা-গড়ার গতিও মন্থর। কিন্তু যে-নদী দুর্ধর্ষ বেগবতী ও খরস্রোতা তার ভাঙনের গতিও প্রচণ্ড। যত দ্রুত সে ভাঙে, তত দ্রুত সে নতুন গতিপথ তৈরি করতে পারে না, তার স্থিতি সময়সাপেক্ষ। বহু পুরনো উপমা হলেও, সমাজের গতির সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। আগেকার যুগে সমাজের গতি ছিল মন্থর, তাই সমাজের ভাঙন ও গড়নের সঙ্গে মানুষ ধীরেসুস্থে খাপ-খাইয়ে নিতে পারত। বর্তমানে সমাজের পরিবর্তনের গতি এত প্রবল যে তার ভাঙনের ব্যাপকতার সঙ্গে এবং গড়নের নতুন পদ্ধতি ও পথের সঙ্গে, মানুষ সামঞ্জস্য স্থাপনে ব্যর্থ হচ্ছে। ভাঙনের রূপ এবং গড়নের নতুন টেকনিক এখনও সম্পূর্ণ-রূপে আমরা বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারিনি। গড়নের নতুন কলাকৌশল আরও তৎপরতার সঙ্গে উদ্ভাবন করা এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করাই হল আজকের বড় সমস্যা। তা না হলে, ভাঙন ও গড়নের মধ্যে 'gap' বা

ব্যবধান এত বেড়ে যাবে যে গড়নের কোনো সম্ভাবনাই পরে আর থাকবে না। তার জন্য সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে, কারণ একথা সবসময় মনে রাখা দরকার যে সামাজিক শক্তির বিকাশের মধ্যে spontaneity বা automatism, বা স্বয়ংক্রিয়তা বলে কিছু নেই। সামাজিক শক্তির আধার যে মানুষ, সেই মানুষকেই সচেতন ও সক্রিয়ভাবে তার বিকাশে অংশগ্রহণ করতে হবে। এই সামাজিক গুরুদায়িত্ব বহন করার প্রধান ভার আজ সমাজের নানারকমের সভা সমিতি অ্যাসোসিয়েশন ও গোষ্ঠীর উপর পড়েছে। বর্তমান যুগে এই জাতীয় অ্যাসোসিয়েশনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা কি এবং তার দায়িত্ব ও কর্তব্যই বা কি, সে সম্বন্ধেও আজ তাই আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

গোষ্ঠীবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়া মানুষের অন্যতম সামাজিক বৃত্তি। একথা সকলেই জানেন। কিন্তু গোষ্ঠী ও সংঘের শ্রেণীভেদ আছে মানুষেব সমাজে। সমাজবিজ্ঞানীরা এইসব গোষ্ঠী ও সংঘকে দুই শ্রেণীতে ভাগ কবেছেন--Primary Groups ও Secondary Groups—প্রাথমিক গোষ্ঠী বা সংঘ এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠী বা সংঘ। কেউ কেউ একে in-groups বা অন্তর্গোষ্ঠী এবং out-groups বা বহির্গোষ্ঠীও বলেন। প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হল, তা আয়তনে ছোট এবং গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মুখোমুখি পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা থাকে। পরিবার বা family হল এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ছোট ছোট ক্লাব ও সংঘ অনেক আছে সমাজে, যাদের সভ্যসংখ্যা কম, উদ্দেশ্যও সীমাবদ্ধ এবং সভ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও মুখোমুখি পরিচয়ও কিছুটা আছে। তাদের ঠিক পরিবারের মতো প্রাথমিক গোষ্ঠী বলা যায় না, আবার বাইরের বড় বড সভা-সমিতির মতো মাধ্যমিক গোষ্ঠীও বলা যায় না—intermediate groups—বা মধ্যবর্তী গোষ্ঠী বলা যায়। বড় বড় মাধ্যমিক গোষ্ঠী ও সভার বৈশিষ্ট্য হল, তার উদ্দেশ্যের বন্ধন আছে, সভ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা নেই। যেমন বড় বড রাজনৈতিক পার্টি। আজ-কালকার মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অ্যাসোসিয়েশনও তার দৃষ্টান্ত অ্যাসোসিয়েশনের সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হয়ত নেই, কিন্তু তবু প্রত্যেকে কতকগুলি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজনবোধ করেন এবং সেই উদ্দেশ্যের অদৃশ্য বন্ধনেই সংবদ্ধ হন। সমাজের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যত অতীতের দিকে ফিরে যাওয়া যাবে, তত এই ধরনের 'গ্রুপ' ও অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা কমে যাচ্ছে,

বিশেষ করে কয়েক ধাপ পিছিয়ে গেলে বড় বড় মাধ্যমিক অ্যাসোসিয়েশন একেবারেই নেই দেখা যায়। প্রাইমারি গ্রুপের সংখ্যাই সেখানে বেশি এবং একেবারে আদিম সমাজে 'পরিবার' ছাড়া আর কোনো গ্রুপ বিশেষ নেই। মধ্যযুগে বণিক-কারিগরদের Guild ছিল, ধর্মসংঘ ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগের অ্যাসোসিয়েশনের গড়ন বা লক্ষ্য, কোনটার সঙ্গেই তার তুলনা করা যায় না। আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে, ব্যক্তিস্বাধীনতা (freedom of individual) এবং সংঘ-গঠনের স্বাধীনতার (freedom of association) জন্য, গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ হয়েছে এইসব মাধ্যমিক অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যাবৈচিত্র্যের মধ্যে। সেইজন্য আজ এইসব সুসংগঠিত অ্যাসোসিয়েশন, ইউনিয়ন, সোসাইটি ও সভা-সমিতি গণতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার সমাজে এই ধরনের অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। মানুষের সে চেতনা বা অধিকার, কোনটাই ছিল না। তা ছাড়া, সবচেয়ে বড় কথা, কর্ম-জীবনের ও মনের প্রসারতাও তখন ছিল না। পরিবার, পাড়া ও গ্রামের মধ্যেই জীবনের চলাফেরা, কাজকর্ম সব সীমাবদ্ধ ছিল, মনটাও তার বাইরে ডানা মেলতে পারত না। আজকাল মানুষের কর্মজীবন প্রসারিত হয়েছে, ক্ষুদ্র পাড়া বা গ্রাম বা স্থানীয় অঞ্চলের গণ্ডি থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। যেকোন অফিসের কর্মচারীদের কথাই ধরা যাক। বাঙালী কর্মী যাঁরা, তাঁরাও নিজেদের পাড়া-পল্লী ছেড়ে কতদূরে কাজ করতে আসেন। কলকাতা শহরের বাইরে, ২০/৩০/৪০/৫০ মাইল দূর থেকেও অনেকে হয়ত 'ডেলি প্যাসেঞ্জারি' করেন। তার চেয়েও দূর থেকে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, অনেকে এখানে কাজ করতে এসেছেন সকলে মিলে সংঘ বা অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছেন। এই সংঘ গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে, মনের ও কর্মজীবনের প্রসারতার জন্য। কর্ম-জীবনের ও মনের এই বিকেন্দ্রণ বা decentralisation, আধুনিক বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের যুগের এটা অন্যতম বিশেষত্ব। সমাজবিদরা একে 'delocalisation of mind' বলেছেন। ক্ষুদ্রগণ্ডি পাড়া-পল্লী থেকে বৃহত্তর সমাজ পর্যন্ত মানুষের মন আজ প্রসারিত হয়েছে। এই প্রসারণ সম্ভব হয়েছে এই-জাতীয় বড় বড় মাধ্যমিক অ্যাসোসিয়েশনের ভিতর দিয়ে। এই প্রসারণ ভিন্ন গণতান্ত্রিক শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হত না। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডির পরিবেশের মধ্যে গণতন্ত্রের বীজ অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষুদ্রতা দীনতা স্বার্থপরতা এবং উগ্র অহম্‌সর্বস্বতা

ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বড় মাধ্যমিক অ্যাসোসিয়েশনে তার সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের প্রাথমিক গোষ্ঠী পরিবারের মধ্যে যখন আমরা মানুষ হই, তখন প্রত্যেক পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা ঐতিহ্য অনুযায়ী আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। সব পরিবার একরকমের নয়, স্বভাবতই তাই সকলের ব্যক্তিচরিত্র একই ছাঁচে গড়ে ওঠে না। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়ে যখন আমরা বাইরের বৃহত্তর অ্যাসোসিয়েশনে এসে মিলিত হই, তখন আমাদের ব্যক্তিচরিত্রের অনেক দোষত্রুটি মার্জিত ও সংশোধিত হবার সুযোগ পায়। বাইরের অ্যাসোসিয়েশন প্রত্যেক ব্যক্তিচরিত্রের Socialisationএ, বা সামাজিক রূপায়ণে সাহায্য করে। ব্যক্তিচরিত্রের যাকিছু অসমতলতা, তাকে সমাজচরিত্রের সঙ্গে সমতল করে তোলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাতে সংযত হয় বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় না। বিলুপ্ত হলে আবার বিপদের সম্ভাবনা থাকে। গণতন্ত্রের বদলে মুষ্টিমেয় দুএকজনের স্বেচ্ছাতন্ত্র সেই সুযোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির বা ব্যক্তিত্বের বিলোপ নয়, তার সংযম নিয়ন্ত্রণ এবং সামাজিক রূপায়ণই গণতন্ত্রের আদর্শ। গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে বড় বড় অ্যাসোসিয়েশনেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত, ব্যক্তিচরিত্রকে এইভাবে গড়ে তোলা।

প্রত্যেক অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকটি প্রধান লক্ষ্য থাকে, সে-কথা আগেই বলেছি। যেমন কর্মচারী বা শ্রমিকদের ইউনিয়ন-অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান লক্ষ্য 'অর্থনৈতিক'। বর্তমান সমাজে আর্থিক বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচার আছে বলেই, এইধরনের অ্যাসোসিয়েশন-ইউনিয়নে সংঘবদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করার গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের আছে। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশন গড়ার উদ্দেশ্য যদি কেবল অর্থনৈতিক হয়, তাহলে সেটা কেবল **economism** ও **unionism** হয়ে ওঠে। সঙ্গত আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য, কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড করা, অর্থাৎ যে মানুষের জন্য, সেই মানুষই যদি এর মধ্যে পচে-গলে বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে কার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে? সঙ্গে সঙ্গে তাই মানুষের চরিত্রের গণতান্ত্রিক বিকাশের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যে-মানুষ ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভার বহন করবে, তার নিজের চরিত্রও তো সেইভাবে গড়ে তোলা দরকার। তার মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধও জাগিয়ে তোলা দরকার। কে বা কারা তা গড়ে তুলবে? গড়ে তুলবে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী, গ্রুপ ও অ্যাসোসিয়েশন। প্রথমে গড়বে

primary group বা পরিবার। পরিবারের গডন ও পরিবেশকে তার জন্য সুস্থ করতে হবে। তারপর গড়ে তুলবে বাইরের ছোটবড অ্যাসোসিয়েশন। পরিবারের প্রভাব সমাজে চিরকাল যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কিন্তু যে সমাজে গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ যত বেশি হবে, সেই সমাজে মাধ্যমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রভাব তত বাড়বে মানুষের জীবনে। পারিবারিক গোষ্ঠীবন্ধন ও দৃঢ়তা স্বভাবতই তার জন্য খানিকটা শিথিল হবে পরিবারের চেয়ে আজকের সমাজে বাইরের সভা-অ্যাসোসিয়েশনের আকর্ষণ মানুষের কাছে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। প্রতিদিন আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। সেইজন্য আজ বাইরের অ্যাসোসিয়েশনের সামাজিক দায়িত্ব আরও বেশি বেড়েছে। ব্যক্তিচরিত্রের রূপায়ণে পরিবারেব খানিকটা দায়িত্ব আজ বাইরের অ্যাসোসিয়েশনকেই পালন করতে হবে। তার উপর তাব নিজস্ব দায়িত্ব তো আছেই। এই দায়িত্ব হল, অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের ব্যক্তিচরিত্রকে মানবিক ও সামাজিক করে তোলা, এবং কেবল অর্থনৈতিক চিন্তা ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে স্বাধীনভাবে ও সুস্থভাবে চিন্তা করতে শেখানো। তার জন্য একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যসূচীও প্রত্যেক অ্যাসোসিয়েশনের থাকা উচিত। যেমন সমাজের নানারকমের সমস্যা নিয়ে মধ্যে মধ্যে আলাপ-আলোচনা করা, দেশের শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও শিল্পকলার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, তার সুস্থ বিকাশে সাহায্য করা।

১৯৫৮

শিবনাথ শাস্ত্রী

'আমি শৈশবাবধি বিদ্যাসাগরের চেলা।' একথা শিবনাথ শাস্ত্রী বলতেন। তাঁর পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য এবং মাতুল পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ উভয়েই ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাজেই বাল্যকাল থেকে বিদ্যাসাগর শিবনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। শিবনাথের কৈশোর বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারকর্মের দ্বিপ্রহর। যৌবনে জীবনের সকলরকমের সমস্যা ও সংকটের মধ্যে বিদ্যাসাগরের সাহচর্য ও পরামর্শ শিবনাথের কাছে সহজলভ্য ছিল। অনেকক্ষেত্রে শিবনাথ বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের চেলা ছিলেন, কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া, যে-ক্ষেত্রে শিবনাথের ব্যক্তিত্বের সমগ্ররূপ অভিব্যক্ত। সেই ক্ষেত্রটি হল 'ধর্ম'। বিদ্যাসাগরের কাছে ধর্মের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ছিল না, তাঁর মানববোধ ও সমাজবোধের মধ্যে ধর্মবোধ বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তাই পৃথক প্রার্থনা ও উপাসনার ভিতর দিয়ে কোনো অধ্যাত্মলোকে তিনি কখনও শান্তি বা মুক্তি কামনা করেননি। শিবনাথের কাছে ধর্মজীবনই ছিল মুখ্য, জীবনের মূল ভিত্। ধর্মের এই ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর মানববোধ ও সমাজবোধ। তাঁর সমগ্র সত্তা ও ব্যক্তিত্ব ধর্মভাবের অলৌকিক রাগে রঞ্জিত। চলিত অর্থে 'ধার্মিক' নয়, দার্শনিক অর্থে শিবনাথ ছিলেন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ পুরুষ। তাঁর বিচিত্র কর্মবহুল জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই ধর্মপ্রাণতা প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় মালিন্যের ঊর্ধ্বে তাঁকে এক ইন্দ্রিয়াতীত স্বৈর্যের রাজ্যে সমাহিত করে রাখত। তাঁর

কর্মজীবনেরও সমস্ত শক্তির উৎস ছিল এই ধর্মবোধ। গুরু বিদ্যাসাগর ও চেলা শিবনাথের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল এইখানে।

পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের চরিত্রের মধ্যে মিলও ছিল অনেক। বিদ্যাসাগরের শিষ্যত্ব দাবি করার অধিকার ছিল শিবনাথের। চারিত্রিক দৃঢ়তা নিষ্ঠা সমাজচিন্তা উদারতা ও আত্মবিশ্বাস, সবদিক দিয়েই শিবনাথ ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বালিকাবধূ প্রসন্নময়ীর সঙ্গে যখন পিতার মেজাজের জন্য তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল এবং পিতারই আদেশে যখন আঠার-উনিশ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ (বিরাজমোহিনীকে) করতে বাধ্য হলেন, তখন তিনি লিখেছেন, 'আত্মনিন্দাতে আমার মন অধীর হইয়া উঠিল।' 'এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলাম।' এইসময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ হল। পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তিরস্কার করেন। শিবনাথ পিতাকে বলেন, 'আপনার সকল আজ্ঞা পালন করিতে রাজি আছি, কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দিবেন না।' তখন শিবনাথের ছাত্রজীবন, তিনি দক্ষিণকলিকাতায় থাকতেন। পুত্রের এই কথাবার্তা শুনে পিতা যখন গ্রামে ফিরে গেলেন, তখন তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে কেমন আছে। পিতা অধিকতর গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন 'সে মরেছে।' শিবনাথ লিখেছেন, 'অমনি আমার মা 'ওগো কি বল গো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পাশের বাড়ির মেয়েরা ছুটিয়া আসিলেন। তখন বাবা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, সে মরার মধ্যে। সে ব্রাহ্মসমাজে যেতে আরম্ভ করেছে, আমি বারণ করলেও শুনবে না।'

ব্রাহ্মসমাজের এই নতুন ধর্মচেতনার মধ্যে শিবনাথ এক আশ্চর্য প্রাণশক্তির উৎস আবিষ্কার করেছিলেন, এবং সেই শক্তি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, বারংবার মৃত্যু ঘটায়নি। এই বয়সেই তাঁর নতুন ধর্মবিশ্বাস অনুসারে চলবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি যখন গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত থাকতেন তখন কুলদেবতাদের প্রতিমাগুলিকে তিনি নিজেই পুজো করতেন। এবারে তিনি স্থির করে গেলেন 'ঠাকুরপুজো' আর করবেন না। 'গিয়াই মাকে সে সংকল্প জানাইলাম।' তার পর কি হল?

> মা ভয়ে অবশ হইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন একটা মহা সংগ্রাম আসিতেছে। আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। আমিও কোনও মতেই প্রস্তুত হইতে পারিলাম না। ধর্মে প্রবঞ্চনা রাখিতে পারিব না বলিয়া করযোড়ে মার্জনা

ভিক্ষা করিলাম। অবশেষে সেই সংকল্প যখন বাবার গোচর করা হইল, তখন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ন্যায় তাঁহার ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কুপিত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া ঠাকুরঘরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। আমি ধীরভাবে বলিলাম, 'কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ওখানে লইতে পারিবেন না।' এই কথা শুনিয়া ও আমার দৃঢ়তা দেখিয়া তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলেন এবং প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন। অবশেষে আমাকে পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া নিজে পূজা করিতে বসিলেন। সেই দিন হইতে আমার মূর্তিপূজা রহিত হইল

লাঠি হস্তে ধাবিত অগ্নিমূর্তি পণ্ডিত পিতা চিরাচরিত বাহ্যানুষ্ঠানসবস্ব ধর্মবিশ্বাসের উগ্র প্রতিমূর্ত, এবং তাঁর সামনে দণ্ডায়মান অটল আত্মবিশ্বাস ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি নবীন তরুণ ব্রহ্মোপাসক পুত্র শিবনাথ। পিতার আত্মসমর্পণের মানে হল অন্তরের অনাড়ম্বর অকৃত্রিম সরল ঈশ্বর-উপাসনার কাছে ঢাকঢোল-কাঁসরঘণ্টা-নিনাদিত মূর্তিপ্রান্তে আবদ্ধ দেবতার পূজার পরাজয়। যেমন প্রসন্নময়ীর ক্ষেত্রে রামচন্দ্রের মতো তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করেছিলেন, ধর্মের ক্ষেত্রে তা করেননি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তাঁর এই বিদ্রোহ যে আদর্শ-সংঘাতের সাময়িক উত্তেজনাসম্ভূত নয়, সততা ও গভীর সত্যবিশ্বাসে প্রোথিত, ব্রাহ্মসমাজের বিভেদ-বিচ্ছেদের ইতিহাসে তাঁর সত্যনিষ্ঠ বিদ্রোহীর ভূমিকা বিচার করলে তা বোঝা যায়।

১৮৪৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম এবং ১৮৭২ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ছাত্রজীবনের শেষ। কিন্তু ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর কর্মজীবনের আরম্ভ। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের কাজে এইসময় থেকে তিনি একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হন। বিদ্যাসাগরের চেলা তিনি, কাজেই ১৮৬৭ সালে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি বিধবাবিবাহ দেন। বিবাহ উপলক্ষে বিদ্যাসাগরের কাছে যান এবং বিদ্যাসাগর বিবাহের সমস্ত খরচ ও কন্যার গহনা দেন। ১৮৬৯ সাল থেকেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়। তখন তিনি এফ এ. পাস করেছেন। তার আগে থেকেই তিনি

ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন এবং ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি করে মূর্তিপূজাও পরিহার করেছিলেন। এইসময় ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্তনের ইতিহাসে প্রথম সংকট দেখা দেয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেনের মনোভঙ্গির পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজে বিচ্ছেদ ঘটায়। ৮৬৭ সাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শিবনাথের আকর্ষণ ছিল, কিন্তু তরুণদলের নেতা ছিলেন তখন কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের দল রক্ষণশীল এবং কেশবচন্দ্রের দল প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছিল, যেমন ইতিহাসে প্রবীণ ও নবীনের দল চিরদিন অভিহিত হয়ে থাকে তেমনি। শিবনাথ স্বভাবতই কেশবচন্দ্রের উন্নতিশীল দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। ২২ আগস্ট ১৮৬৯ উন্নতিশীল দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। এইদিন কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু, রজনীনাথ রায়, শ্রীনাথ দত্ত প্রমুখ কুড়িজন যুবকের সঙ্গে শিবনাথ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর ছাব্বিশ বছর আগে, ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৩ (৭ পৌষ ১৭৬৫ শক) দেবেন্দ্রনাথও কুড়িজন সহকর্মীর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ-সহ একুশজনের এবং ১৮৬৯ সালে শিবনাথ-সহ একুশজনের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে দুটি ঐতিহাসিক বাঁক পরিবর্তন।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর দেবেন্দ্রনাথ বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল·· ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম এবং ব্রাহ্মসমাজের পার্থক্য সম্পাদন করিলাম।' দেবেন্দ্র-নাথের দীক্ষাকালে ব্রাহ্মধর্মের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা হয়, শিবনাথের দীক্ষাকালে হয় ব্রাহ্মধর্মের পর্বান্তর। শিবনাথ লিখেছেন, 'আমি উন্নতিশীল দলের সঙ্গে হাড়ে হাড়ে বাঁধা পড়িলাম। অথচ শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য বোধ করিবেন যে ইহার পরও আমি তাঁহাদিগের সঙ্গ হইতে লজ্জাবশতঃ দূরে থাকিতাম, তখন আমি প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করিতাম (যদিও উপবীতটা তখন ছিল), কিন্তু ব্রাহ্মদের সঙ্গে বড় মিশিতাম না। মধ্যে মধ্যে রবিবারে প্রাতে কেশববাবুর কলুটোলার বাড়িতে উপাসনাতে যোগ দিতে যাইতাম, কিন্তু কীর্তনের সময় ব্রাহ্মদিগের অনেকে গড়াগড়ি দিতেন, নানাপ্রকার চীৎকার করিতেন ও পরস্পরের পা ধরাধরি করিতেন, কেশববাবুর পায়ে পড়িতেন, এজন্য ভাল করিয়া উপাসনাতে যোগ দিবার ব্যাঘাত হইত। সেই কারণে সর্বদা যাইতাম না।'

শিবনাথ শাক্তবংশের সন্তান, কাজেই বৈষ্ণবদের ভাবোন্মত্ত কীর্তন ও ঢলাঢলি তাঁর কোনদিনই ভাল লাগত না। তিনি শুধু ব্রাহ্ম ছিলেন না, শক্তিবাদে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ছিলেন। ব্রাহ্মরা যখন কেশবচন্দ্রকে 'প্রভু ত্রাণকর্তা' বলে সম্বোধন করে তাঁর চরণ ধরে গড়াগড়ি দিতেন এবং ভাবাচ্ছন্ন হয়ে তাঁর চারিদিকে ঢলাঢলি করতেন, তখন শিবনাথের কাছে তা যে শুধু বুদ্ধিভ্রম বা চিত্তবিকার বলে মনে হত তা নয়, ব্রাহ্ম হিসাবে নৈতিক বিচ্যুতি বলেও মনে হত। আদর্শ ও নীতির ক্ষেত্রে মুখে বলা ও কাজে করার মধ্যে কোনো পার্থক্য শিবনাথ কল্পনা করতে পারতেন না। তাই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেবার কিছুদিন পরে তিনি পারিবারিক নিগ্রহ ও বিচ্ছেদবেদনা সহ্য করেও ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। তার জন্য তাঁর পিতা আঠার-উনিশ বছর তাঁর মুখদর্শন করেননি এবং তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপও করেননি।

কেশবভক্তদের বৈষ্ণব আচরণ লক্ষ্য করে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র নিজে যে ভক্তিবাদ ও অবতারবাদের মোহজালে জড়িয়ে পড়েছেন বা পড়তে পারেন, একথা সহজে তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি কেশবচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন বলে তাঁর প্রতি আকর্ষণও সহজে ছিন্ন হয়নি। কেশবচন্দ্রের কাছে তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নিভরতা এবং সমাজসেবার বিভিন্ন দিকে শিক্ষালাভ করেছেন। অনেক দিক থেকে কেশব ছিলেন শিবনাথের গুরু। দেবেন্দ্রনাথ-কেশবের মতো শেষ পর্যন্ত কেশব-শিবনাথের মধ্যেও ব্রাহ্ম মতাদর্শের ব্যাপারে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অবতারবাদের গহ্বরে কেশব ক্রমে তলিয়ে যেতে থাকেন, এবং তাঁর এমন অবস্থা হয় যে নিজেকে 'জননী' ও ভক্তদের 'সন্তান' ছাড়া তিনি আর কিছুই ভাবতে পারতেন না। কেশবভক্তদের মুখে পাপ-পুণ্য ভক্তি-মুক্তি ঈশ্বর-অবতার ইত্যাদি কথা অবিরাম উচ্চারিত হত। ১৮৭৫-৭৬ সালের কথা। এই সময়কার কথা মনে করে বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন

> They were almost always talking of sin and salvation, of prayer and divine worship. All these unrealities of the current ideals and practices of Samaj seriously influenced the generation of youthful students to which I belonged. I had, therefore, not only no

> **attraction for the Brahmo Samaj when I first came to Calcutta, but even felt an increasing repulsion towards it.**

শিবনাথের নিজের উক্তিতেও বিপিনচন্দ্রের এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসগ্রন্থে (ইংরেজি) শিবনাথ লিখেছেন যে কেশবচন্দ্রের অভ্যুদয়কালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দেশের তরুণদের যে আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা ছিল, ১৮৭৬ সালের আগেই তা প্রায় শেষ হয়ে যায় (**'wellneigh ceased before 1876'**)। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহও তরুণদের মধ্যে যথেষ্ট কমে যায়। কেশবচন্দ্রের নৈতিক বিভ্রান্তির প্রভাব থেকে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করার জন্য শিবনাথ এইসময় 'সমদর্শী' নামে একটি গোষ্ঠী স্থাপন করে এই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—এঁরা ছিলেন গোষ্ঠীভুক্ত, শিবনাথ ছিলেন গোষ্ঠীনেতা ও পত্রিকা সম্পাদক। ১৮৭৭ সালে শিবনাথ আর-একটি ব্রাহ্ম-চক্র (**'inner circle'**) গঠন করেন এবং তাতে বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি যোগ দেন। ১৮৭৮ সালের গোড়াতেই বিখ্যাত কুচবিহার-বিবাহের গুজব কলকাতা শহরে রাষ্ট্র হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র নিজেই ১৮৭২ সালের তিন-আইন বিবাহের বিধিবদ্ধতার জন্য আন্দোলন করেন, এবং শেষকালে সেই আইন ভঙ্গ করে কুচবিহার রাজপরিবারে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন (৩১ জানুয়ারি ১৮৭৮)

> কেশববাবু যে কেন এরূপ অবিবেচনার কার্য করিতেছেন, দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেছি। তাঁহাকে **Principled Man** বলিয়া শ্রদ্ধা ছিল, সে শ্রদ্ধাও আর থাকে না। তাঁহার এরূপ কার্যে সমাজের বিশেষ অমঙ্গল হইবে। অতএব ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন করা আবশ্যক, কারণ তাহা হইলে সমাজের মুখ রক্ষা হইবে।

আন্দোলন চালাবার জন্য 'সমালোচক' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, শিবনাথ তার সম্পাদক হন। কিন্তু আন্দোলন ও প্রতিবাদে কেশবচন্দ্রকে বিরত করা সম্ভব হয়নি। কেশবচন্দ্র নিজে কুচবিহার গিয়ে, অনেকটা হিন্দুমতে, রাজপরিবারে নাবালিকা কন্যার বিবাহ দেন (৬ মার্চ ১৮৭৮)। তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের বাদপ্রতিবাদের পরিণতি হয় বিচ্ছেদ।

বিদ্রোহী ব্রাহ্মরা কেশবচন্দ্রের দল ছেড়ে এসে ১৫ মে ১৮৭৮ সালে টাউনহলে সভা ডেকে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৭৯ সালে মাঘোৎসবের সময় কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বর্তমান স্থানে তার ভিত্ স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মসমাজের এই দ্বিতীয় ও শেষ বিদ্রোহের প্রধান নায়ক শিবনাথ শাস্ত্রী। জীবনের বাকি দিনগুলি তিনি এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজেই উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি বলেছেন : 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাই আমার জীবনের প্রধান কাজ।' সমাজের বাংলা মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' ও ইংরেজি 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকা সম্পাদন করতেন শিবনাথ।

বিপিনচন্দ্র তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে শিবনাথের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং শিবনাথের ব্রাহ্মধর্মাদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগও ছিল আন্তরিক। এই অনুরাগ ও আকর্ষণের কারণ হল, শিবনাথের ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সুর উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হত। বিপিনচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, **'Social freedom and national emancipation were both organic elements of Shivanath's religion and piety.'** শিবনাথ ছিলেন আজন্ম 'ডেমোক্রাট.' আদর্শের নামে স্বেচ্ছাচারিতা অথবা ব্যক্তিগত প্রভুত্বের ঘোরতর বিরোধী। কেশবচন্দ্রের গুরুবাদ ও একনায়কত্বের কোনো স্থান নেই সাধারণ ব্রহ্মসমাজে এবং সাধারণ কথার সামাজিক তাৎপর্য যে 'সাধারণ' ছাড়া অন্য কিছু নয়, একথা সমাজকর্মীদের কাছে তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন। তার চেয়েও বড় কথা হল, ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ও চরিতার্থতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার মধ্যে। ধর্ম ও দেশপ্রেম তাই শিবনাথের ব্রাহ্ম আদর্শের মধ্যে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার আগে শিবনাথ যে ব্রাহ্ম-চক্র গঠন করেন তার জন্য একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হয় রচনা করেন শিবনাথ। তার মূল কথাগুলি হল

> প্রতিমা পূজা করব না। কথায় ও কাজে জাতিভেদ মানব না। পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করব। নিজেরা একুশ বছরের আগে বিবাহ করব না এবং কোন বালিকাকে ষোল বছরের আগে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব না। স্ত্রীলোক ও জনসাধারণের মধ্যে যথাসাধ্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করব। দেশের লোকের শক্তি শৌর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চা, অশ্বারোহণ,

বন্দুকচালনা অভ্যাসের কথা প্রচার করব। স্বায়ত্তশাসনই শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা, দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশায় নিপীড়িত হলেও বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করব না।

জাতীয়-কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে বাংলার ও ভারতের প্রথম মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ভারত-সভা' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপিত হয় ২৬ জুলাই ১৮৭৬। শিবনাথ তাঁর বন্ধু আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে এই রাজনৈতিক সভা স্থাপনের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে যান। বিদ্যাসাগর প্রথম সভাপতি হন, এই তাঁদের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁদের উৎসাহ দিলেও সভাপতি হতে সম্মত হননি। মধ্যবিত্ত রাজনীতির আবেদন-নিবেদন ও নেতৃত্বের দলাদলির কথা মনে করেই বোধহয় বিদ্যাসাগর দূরে থাকতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস-পবের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত রাজনীতির পথপ্রদর্শকদের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ, আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শিবনাথের পূর্বোক্ত ব্রাহ্মচক্রের প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে—'দেশের লোকের শক্তি ও শৌর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চা বন্দুকচালনা অভ্যাসের কথা প্রচার করব'—এই প্রতিজ্ঞাটি থেকে মনেহয় 'বিদ্যাসাগরের চেলা' শিবনাথও হয়ত তাঁর গুরুর মতো মধ্যবিত্তের নিবেদনপ্রধান রাজনীতির অসারতা বুঝতে পেরে, কতকটা হতাশায়, প্রধানত ধর্মকর্ম ও সমাজ কল্যাণকর্মে আত্মোৎসর্গ করেছেন।

১৩৭৬ | ১৯৬৯

সমাজপতি মহারাজা নবকৃষ্ণ

বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরজী মহাদেব। বিশ্বেশ্বর-বিশ্বনাথ বারাণসীকে ভারতের অন্যতম হিন্দুতীর্থে পরিণত করেছেন তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্যগুণে। তাঁরই পাশে একধারে প্রতিষ্ঠিত আছেন শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর। দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের পাশে এই নবকৃষ্ণেশ্বর কে? মানুষ, না দেবতা? মহাদেবতার পাশে নগণ্য মানুষ পূজিত হবে কি করে? শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর আমাদের বঙ্গদেশের মহারাজা নবকৃষ্ণ, কলকাতার প্রাচীন শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অনেকের কাছে আজ বিশ্বাস্য হবে না শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের 'শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর' রূপ ধারণ করার কাহিনী, অথবা তাঁর বিস্ময়কর বাহাদুরী। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে অষ্টাদশ শতকে নবকৃষ্ণের কালে সমাজে এমনসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটত, যা আজকের দিনে অবিশ্বাস্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগের বহু বিচিত্র ঘটনা অষ্টাদশ শতকের লোকের কাছেও তাজ্জব বলে মনে হত। অতএব মহারাজা নবকৃষ্ণের কথা এবং তাঁর 'শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর' রূপধারণের কাহিনী তাঁরই কালের দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে।

আমাদের দেশের প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু একদা কামনা করতেন যেন শেষজীবনে কাশীবাসী হতে পারেন এবং কাশীর বিশ্বনাথধামে দেহ-ত্যাগ করে স্বর্গলোকে স্থায়ী আসন দখল করতে পারেন। রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের মনেই সংসারধর্ম পালনের পর এই

কামনা মূর্ত হয়ে উঠত। মহারাজা নবকৃষ্ণের মনেও তা-ই হয়েছিল। তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রে অনেক প্রকারের কর্ম-অকর্ম করার পর নবকৃষ্ণের মন এক বিষণ্ণ অবসাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। ক্লাইভের চেয়ে তিনি বয়সে কিছু ছোট ছিলেন এবং প্রায় সমবয়সী ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের। ক্লাইভ ও হেস্টিংস, দুই কৃতি পুরুষেরই তিনি ছিলেন মুনশী বা ফার্সী-শিক্ষক। এদেশের রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচও ক্লাইভ-হেস্টিংস তাদের প্রিয় মুনশী নবকৃষ্ণের কাছে শিক্ষা করেছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে পঙ্কিল আবর্ত রচিত হয়েছিল, তাতে মহারাজা নবকৃষ্ণ কর্ণধার না হলে ইংরেজ রাজপুরুষেরা চোখে হয়ত অন্ধকার দেখতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'পলিটিক্যাল দেওয়ান' হয়েছিলেন নবকৃষ্ণ। সবকর্মে দুর্লভ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের জন্যই তিনি যে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কূটনীতি কে কাকে সেদিন বেশি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা-ও আজ তর্কের বিষয়, তবে নবকৃষ্ণের কাছ থেকে এবিষয়েও ইংরেজরা কিছু কম শিক্ষা পাননি। যাই হোক, কেবল যে রাজনীতিতে তা নয়, ব্যবসাবাণিজ্যে ও নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মেও সারাজীবন নবকৃষ্ণ অনেক কঠোর কর্তব্য পালন করেছেন। জীবনের অপরাহ্ণে কাশীধামের দিকে স্বভাবতই তাই তাঁর মন ধাবিত হয়েছিল। ইচ্ছা হয়েছিল স্বনামে একটি শিব বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করবেন। বিশ্বেশ্বরজীর অবাঙালী ভক্তরা, বিশেষ করে পাণ্ডারা, বেশ একটু আপত্তির গুঞ্জন তুলেছিল, কিন্তু বারাণসীর মহারাজা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণ 'কে' এবং তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি কতখানি। কাজেই ওজর-আপত্তি শেষ পর্যন্ত টিকল না, সমারোহে ও সগৌরবে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের পাশে শ্রীশ্রীনবকৃষ্ণেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করা হল। অদ্যাবধি এই শিব পূজিত হয়ে আসছেন যদিও নবকৃষ্ণের এই কীর্তির কথা অনেকেরই আজ মনে নেই।

মহারাজা নবকৃষ্ণের সামাজিক প্রতিপত্তির এটি একটি বড় নিদর্শন। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বিগ্রহ নিয়ে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঐতিহাসিক বিরোধ হয়েছিল। মাতৃশ্রাদ্ধের সময় নবকৃষ্ণের বাসনা হয়, বাংলা দেশের লোকপ্রিয় বিগ্রহগুলি কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধবাসরে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা করেন। এই বাসনা চরিতার্থের জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন। শ্রাদ্ধ শেষ হবার পর অন্যান্য বিগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়া

হয়, কিন্তু অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ জাউকে দেওয়া হয় না কারণ নবকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছিলেন গোপীনাথ তাঁর কাছে থাকতে চান। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তখন জমিদারীর ব্যাপারে হেস্টিংসের নতুন বন্দোবস্তের জন্য নানাদিক থেকে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। মধ্যে-মধ্যে নবকৃষ্ণের কাছে টাকার জন্য তাঁকে হাত পাততে হত, নানাবিষয়ে উপদেশ-পরামর্শও নিতে হত। তিন লক্ষ টাকা নবকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি ঋণ করেছিলেন। গোপীনাথ-বিগ্রহের বিনিময়ে এই ঋণ নবকৃষ্ণ মকুব করতেও রাজি ছিলেন। কিন্তু ঋণ তো দূরের কথা, প্রাণের চেয়েও অধিকতর মূল্য হল আভিজাত্যপ্রসূত সামাজিক মর্যাদার। বিগ্রহ নিয়ে কলকাতা ও কৃষ্ণনগরের দুই মহারাজার মধ্যে মর্যাদার লড়াই বাধল। কৃষ্ণচন্দ্র প্রাচীন রাজবংশের বংশধর, নবকৃষ্ণ একপুরুষের অর্বাচীন মহারাজা। তেজবীর্য কারও কম নয়। বরং একপুরুষের মহারাজার একটু বেশি প্রবীণ ও তরুণের মতো দুই মহারাজার মধ্যে তফাৎ। বিগ্রহ নিয়ে অবশেষে মামলা হল আদালতে, কয়েকহাজার টাকা জলের মতো খরচ হয়ে গেল। জয় হল কৃষ্ণচন্দ্রের। কিন্তু নবকৃষ্ণের নয়। আভি-জাত্যের গর্বোদ্ধত মাথা সহজে হেঁট হবার নয়। আরও কয়েকহাজার টাকা খরচ করে তিনি গোপীনাথের অবিকল একটি মূর্তি ওস্তাদ শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করালেন। তারপর বিগ্রহ পাঠিয়ে দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। কিন্তু কোন্ বিগ্রহটি পাঠালেন, আসল না নকল, তা নিয়ে আজও অনেক কাহিনী শোনা যায়।

মহারাজা নবকৃষ্ণের দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল প্রগাঢ় শোভাবাজারের রাজবাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। সাহেবসুবো থেকে আরম্ভ করে কলকাতা শহরের সকলশ্রেণীর লোক এইসব উৎসবে যোগদান করতেন। দানধ্যান ও ভোজনের প্রলোভনে রবাহুতের সংখ্যাও কম হত না। জাঁকজমক পাল্লা দিয়ে করা হত, কারণ শহরে তখন রাজা-মহারাজা স্তরের আরও অনেক ধনিক ছিলেন, যাঁরা উৎসব-অনুষ্ঠানের সমারোহকে আভিজাত্যের প্রতিযোগিতা বলে মনে করতেন। শোভাবাজারের তালুকদার নবকৃষ্ণের আভিজাত্য ছিল সকলের উপরে, কাজেই উৎসবের জাঁকজমকও তাঁকে সেই অনুপাতে করতে হত। তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ওয়ার্ড সাহেব তাঁর হিন্দুদের ইতিহাস গ্রন্থে (ইংরেজি এই দৃষ্টান্তটি উল্লেখ না করে পারেননি। একবার নবকৃষ্ণ কালীঘাটে কালীমন্দিরে পুজো দিতে যান। অমাত্য-আমলাবর্গ, ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-পণ্ডিত শত শত তাঁর সঙ্গী হন।

পুজো উপলক্ষে একলক্ষ টাকা খরচ হয়। দশহাজার টাকার একটি স্বর্ণহার নবকৃষ্ণ মা কালীকে উপহার দেন। তার সঙ্গে আরও নানারকমের অলঙ্কার দেওয়া হয় এবং খাট-বিছানা, রূপোর থালা-বাসন ইত্যাদিও অনেক দান করা হয়। কয়েক হাজার ভিখিরিও মহারাজার অর্থদান গ্রহণ করে। শোভাবাজার থেকে কালীঘাট পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হয়।

ধর্মেকর্মে যেমন, সামাজিক কাজকর্মেও তেমনি নবকৃষ্ণ তাঁর আভিজাত্য-গৌরব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। মনেহয় সামাজিক ব্যাপারে তাঁর পদমর্যাদার চেতনা আরও বেশি প্রখর ছিল। তা-ই থাকার কথা। সেকালে সামাজিক মর্যাদার লড়াই চলত প্রকাশ্যে ধনদৌলত প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে। প্রধানত সেই কারণে বড় বড় বিত্তশালী পরিবারে উৎসব-অনুষ্ঠানের জাঁকজমক খুব বেশি পরিমাণে হত। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানগুলিতে সমারোহ এমন পর্যায়ে পৌঁছত যা আজকের দিনে বাস্তবিকই কল্পনা করা যায় না। এইরকম সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি রূপকথা রচনা করেছে। অবশ্য কেবল নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ নয়, তাঁর সমকালীন আরও কয়েকজন ধনিক বাঙালীর মাতৃশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান আজ অনুরূপ কাল্পনিক কাহিনী বলে মনে হয়। ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। বর্তমান টাকার মূল্যে বিচার করলে অন্তত দু'কোটি টাকা হবে। মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রায় এই একই পরিমাণ টাকা তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করেন। তবে ওয়ার্ড সাহেব লিখেছেন যে, নবকৃষ্ণ বেশির ভাগ টাকা দানধ্যানে ব্যয় করেন। দানের মধ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দানই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ওয়ার্ড ব্রাহ্মণদের দানের এই তালিকাটি দিয়েছেন

জিনিস	প্রত্যেকটির মূল্য
পালঙ্ক	২০০৲—৩০০
সোনা-রূপোর কলস	১০০০৲—২০০০
সোনা-রূপোর থালা	১০০৲—৫০০
সোনা-রূপোর গেলাস ও পিলসুজ	১০০৲—২০০
সোনা-রূপোর জগ	১০০৲—৫০০
পানের ডিবে	১০০৲—৫০০
কাপড়	১০৲—১৫

কেবল ব্রাহ্মণদের নয়, সাধারণ দরিদ্র লোকদেরও কাপড়চোপড় ও অন্যান্য জিনিস দান করা হয়েছিল। অনেকে এই অনুষ্ঠানকে তখন কলিযুগের এক মহাযজ্ঞ বলে অভিহিত করেছিলেন। 'মুখার্জির ম্যাগাজিনে' (এপ্রিল ১৮৬১) এই অনুষ্ঠানের একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। তার মর্ম এই

> মনেহয় বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে সকলশ্রেণীর লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিল। 'ভিখিরি' 'ভাট' 'পাডিয়া' এরা তো ছিলই, দরিদ্র ও অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত বাদ ছিল না। এমনকি রীতিমত সঙ্গতিপন্ন যাঁরা তাঁবাও এসেছিলেন উপঢৌকনের লোভে। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি দান গ্রহণ করতে পারবে, তাই অধিকাংশ লোকই স্ত্রীপুত্র নিয়ে সপরিবারে এসেছিল, এমনকি কোলের শিশুটিকেও কেউ ফেলে আসেনি। বড বড পুতুল কাপড়ে ঢেকে কোলের শিশু সাজিয়ে অনেকে দান গ্রহণ করেছিল। জিনিসপত্তর ও খাবারদাবাব সববরাহ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। দেশের শত-শত কর্মকার কুম্ভকাব স্বর্ণকাব তন্তুবায় ময়রা প্রভৃতি কারিগরদের আহ্বান করা হয়েছিল এই মহাযজ্ঞেব যোগান দিতে। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল অনুষ্ঠানে,এব° তখনকাব দিনেও নিজের যথেষ্ট আমলাবর্গ পাইক-বরকন্দাজ-সেপাই দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও, মহারাজা নবকৃষ্ণকে পুলিস ও মিলিটারিব সাহায্য নিতে হয়েছিল শৃঙ্খলা বক্ষার জন্য।

দানধ্যানের ব্যাপারে মহারাজা নবকৃষ্ণের উদারতা কেবল পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে নয়, অন্যান্য সমাজিক কাজকর্মেও প্রকাশ পেত। তিনি মনেপ্রাণে হিন্দু ছিলেন ঠিক, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সচরাচর তাঁর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি দেখা যেত না। হিন্দুদের জন্য তিনি বহু দেবালয়, স্নানের ঘাট, তীর্থ-যাত্রার পথ ইত্যাদি নির্মাণ করেছেন। তাঁর মতো আরও অনেক ধনিক রাজা-মহারাজা পুণ্যকর্ম বলে এইসব কাজ সেকালে করেছেন, বহু পাপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য। এ-ব্যাপারে অন্তত নবকৃষ্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে তিনি অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপকারার্থেও যথেষ্ট দানধ্যান করেছেন। কলকাতার 'সেন্ট জন' গীর্জা নবকৃষ্ণের দানের জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। তখনই এই জমিটুকুর দাম ছিল প্রায় ৩০ হাজার টাকার মতো, এখন ৩০ লক্ষ টাকা হওয়াও আশ্চর্য নয়। এছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসকে তিনি ফার্সী-আরবি বিদ্যার চর্চার জন্য মাদ্রাসা

স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রায় তিনলক্ষ টাকা দান করেছিলেন। নবকৃষ্ণ নিজে যে একজন ফার্সী বিদ্যায় বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন সেকথা অবশ্য মনে রাখা উচিত। সেইজন্য শুধু হিন্দুবিদ্যায় নয়, মুসলমানবিদ্যাতেও তাঁর অগাধ অনুরাগ ছিল। সংস্কৃতচর্চার জন্য তিনি যেমন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের অকাতরে দানধ্যান করতেন, বৃত্তি দিতেন, সেইরকম ফার্সীবিদ্যাচর্চার জন্যও মৌলবী-মুনশীদের বৃত্তি দান করতেন। বাংলা দেশের রাজা-মহারাজা ও জমিদারদের সাংস্কৃতিক উদারতার ঐতিহ্য নবকৃষ্ণ আঠার শতকের শেষার্ধে কলকাতা শহরে পূর্ণমাত্রায় বহন করে এনেছিলেন। আধুনিক মহানগরে তাঁকে বিলীয়মান সামন্তযুগের একজন উদীয়মান শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলা যায়।

মহারাজা নবকৃষ্ণের পণ্ডিতসভার তখন এমন খ্যাতি ছিল যে লোকে তাকে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভা বলত। নবকৃষ্ণের বিদ্বৎসভা যাঁরা অলঙ্কৃত করতেন, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ কমলাকান্ত, বলরাম ও শঙ্কর। সভাতে নিয়মিত বিতর্ক হত, তখনকার দিনের নানারকম জটিল সামাজিক সমস্যা নিয়ে। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড পণ্ডিতরা আসতেন এই বিতর্কে যোগদান করতে এবং জয়ের পুরস্কার ও মর্যাদা লাভ করতে। কাশীর বড়-বড় পণ্ডিতরা তখন নিয়মিত আমন্ত্রিত হতেন নবকৃষ্ণের পণ্ডিতসভায়। বাঙালী পণ্ডিতদের সঙ্গে উত্তরভারতের পণ্ডিতদের বহু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়ে তর্কবিতর্ক হত। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো বিখ্যাত সব বাঙালা পণ্ডিতদের কাছে অনেক বাইরের পণ্ডিত তখন পরাজয় স্বীকার করেছেন। বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে মহারাজা নবকৃষ্ণ পণ্ডিতদের পুরস্কার ও বৃত্তি দান করে উৎসাহিত ও সম্মানিত করেছেন। সভাস্থলে বিদ্যাকে বিত্তের মতো শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তখনকার দিনে বাংলা দেশে এমন কোনো খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন কিনা সন্দেহ, যিনি কলকাতার শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের অথবা নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানভাজন ছিলেন না।

ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডিত্য ও পরমায়ু দুই-ই বিস্ময়কর ছিল। নবকৃষ্ণের মারফতে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর পরিচয় পান এবং হিন্দু আইনগ্রন্থ সংকলনের কাজে তাঁকে নিয়োগ করেন। জীবিকানির্বাহ ও গৃহনির্মাণের জন্য নবকৃষ্ণ তাঁকে অর্থ এবং একটি তালুক দান করেন। বছরে

একলক্ষ টাকা আয়ের মতো একটি বড় তালুক তিনি জগন্নাথকে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু জগন্নাথ তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন যে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি তাঁর প্রয়োজন নেই, কারণ বিদ্যানুশীলন ও ভোগবিলাসিতা একসঙ্গে চলতে পারে না। জগন্নাথের ইচ্ছা, তাঁর বংশে বিদ্যাচর্চার ধারা অক্ষুণ্ণ থাক, এবং তা থাকতে হলে লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ভোগ করা চলবে না। কাজেই জগন্নাথ ছোট্ট একটি তালুক নবকৃষ্ণের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন, যার আয় থেকে কোনরকমে দুবেলা খেয়ে পরে চলে যেতে পারে। পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে তিনি শোভাবাজারে একটি বসতগৃহ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। পণ্ডিত রাধাকান্ত তর্কবাগীশকে ১২০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন এবং দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর জন্য 'পণ্ডিতপ্রধান' উপাধি মঞ্জুর করে এনেছিলেন। দেশের পণ্ডিতসমাজের জন্য নবকৃষ্ণের এরকম আরও অনেক কীর্তি স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তাঁর নিজের গ্রন্থাগারটি ছিল তাঁর বিদ্যানুরাগের অন্যতম নিদর্শন। তার জন্য বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি তিনি নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। কেবল সংস্কৃত পুঁথি নয়, আরবি-ফার্সী পুঁথিও তার সংগ্রহশালায় অনেক ছিল। শোভাবাজারের রাজ-পরিবারের এই বিদ্যোৎসাহ নবকৃষ্ণের বংশধরদের মধ্যেও দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

কেবল বিদ্যানুশীলনে নয়, সঙ্গীত ও শিল্পকলার অনুশীলনেও নবকৃষ্ণ যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। কলকাতা শহরে কবিগানের নব্যধারার তিনি ছিলেন প্রধান প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক। শোভাবাজার রাজবংশের অনাথকৃষ্ণ দেব তাঁর 'বঙ্গের কবিতা' গ্রন্থে লিখেছেন : 'কলিকাতার শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনেই প্রকৃত ওস্তাদী কবি-গাহনার প্রথম আবির্ভাব। মহারাজা অতিশয় সঙ্গীত গুণগ্রাহী ও বিলক্ষণ উদারচেতা ছিলেন; কবি-গান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ অনেকে বলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র তাঁহার উৎসাহে তৎকালে কবি-গানের প্রচুর সমাদর হইয়াছিল। মহারাজার নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক একজন বৈদ্যবংশীয় গুণী থাকিতেন, তিনি 'আখড়াই' গাহনা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। এই সেনজা মহাশয় টপ্পাবাজ নিধুবাবুর নিকট-আত্মীয়।' বিখ্যাত টপ্পা গায়ক নিধুবাবুর ভাল নাম রামনিধি গুপ্ত। তাঁর পুত্র জয়গোপাল

গুপ্ত পিতার রচিত সঙ্গীত-সংকলন 'গীতরত্ন' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কুলুই সেন ছিলেন নিধুবাবুর নিকট মাতুলপুত্র। নবকৃষ্ণের পর তাঁর পুত্র মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের আমলে প্রধানত নিধুবাবুর প্রেরণায় আখড়াই গানের চরম বিকাশ হয়।

কবি-গায়কদের মধ্যে নবকৃষ্ণের কালে হরু ঠাকুর শ্রেষ্ঠ বলে সমাদৃত হতেন। তাঁর নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। তিনি কবিয়াল মহলে 'কবির গুরু, ঠাকুর হরু' বলে পরিচিত ছিলেন। বিখ্যাত রাম বসু, যিনি কবিগানের নব্যধারার প্রবর্তক (প্রশ্ন-উত্তর রীতির), হরু ঠাকুরের পরবর্তী। হরু ঠাকুর একটি সখের দল করে মহারাজা নবকৃষ্ণের রাজবাড়িতেই গান করতেন। কবিগায়ক হলেও তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ অত্যন্ত প্রখর ছিল। শোনা যায়, মহারাজা নবকৃষ্ণ একদিন তাঁর গান শুনে খুশি হয়ে তাঁকে একটি দামী শাল উপহার দেন. হরু ঠাকুর সেটি মহারাজার সামনেই তাঁর ঢুলিকে পরিয়ে দেন। মহারাজা তাতে আরও খুশি হন এবং এই তেজস্বিতার জন্য হরুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আরও বেড়ে যায়। রাজকোষ থেকে হরু নিয়মিত বৃত্তি পেতেন এবং নবকৃষ্ণের পরামর্শেই তিনি সখের দল থেকে প্রথম পেশাদার কবিদল গড়ে তোলেন। তাঁর রচিত গানের একটি ছোট্ট নমুনা এই

নাম প্রেম তার, সাকার নহে,
বস্তুটি সে নিরাকার।
জীবন যৌবন, ধন কিবা মন,
প্রাণ বশীভূত তার।

নবকৃষ্ণের প্রতি হরু ঠাকুরের অনুরাগ এত গভীর ছিল যে, নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তিনি কবিগান গাওয়া পরিত্যাগ করেন। নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীদের পোষকতায় পরবর্তীকালে বাংলা কবি-আখড়াই-টপ্পা গানের সমৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু ক্রমে কলকাতা শহরের নব্য-অভিজাতদের কুরুচিস্পর্শে তার বিকৃতি ও অবনতিও দ্রুতগতিতে ঘটতে থাকে।

বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, মহারাজা নবকৃষ্ণের দান নানাবিধ। তৎকালে বাংলা দেশে নদীয়ারাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি একটুও ম্লান হয়নি।

কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীপ্রতাপ ইংরেজ শাসকদের নিত্যনতুন বন্দোবস্তের ফলে অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সমাজে বা সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সেইসময় শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ একটি 'দ্বিতীয় কৃষ্ণনগরের রাজসভা'র পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন নতুন শহর কলকাতায়। সেখানে তাঁরই ছিল অখণ্ড প্রতিপত্তি এবং নতুন ইংরেজ শাসকরা পর্যন্ত সেই প্রতিপত্তি মান্য করে চলতেন। তিনি দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থসমাজভুক্ত হয়েও সর্বসম্মতি-ক্রমে কুলীনমৌলিকসহ সমগ্র কলকাতার কায়স্থসমাজের 'সমাজপতি'র আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৌলিক কায়স্থ হয়ে সমগ্র কায়স্থসমাজের 'সমাজপতি' হওয়া, বিশেষ করে কলকাতার মতো ধনিকবহুল দলাদলিপ্রধান শহরে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হতে পারে তখনকার দিনে, তা আজ কল্পনাতেও অনুমান করা সম্ভব নয়। নবকৃষ্ণ সমাজপতি হয়েছিলেন এবং কলকাতার সম্ভ্রান্ত কুলীন কায়স্থরা তাঁর নেতৃত্ব বিনা আপত্তিতে মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি তিনি একবার কুলীন-মৌলিক উভয় গোষ্ঠীর কায়স্থদের 'একজাই' পর্যন্ত করেছিলেন, অর্থাৎ সকলের বংশানুক্রমের বিশুদ্ধতা যাচাই করে নতুন করে জাতিগত স্তর-বিন্যাস করেছিলেন এবং তাঁর 'একজাই' সকলে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া মহারাজা নবকৃষ্ণ ছিলেন তখনকার 'জাতিমালা কাছারীর' সভাপতি। এই কাছারীর কাজ ছিল জাতিগতভাবে কর্তব্যের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য দণ্ডবিধান করা। এই দণ্ড সমাজের চোখে ভয়ানক দণ্ড ছিল, কারণ সমাজচ্যুতি অথবা জাতিচ্যুতির দণ্ড তখন প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠোরতর বলে গণ্য হত। মহারাজা নবকৃষ্ণ কলকাতার সমাজে এই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, যে-দণ্ডের জন্য আপীল তখন ব্রিটিশের আদালতেও গ্রাহ্য হত না। কোটিপতি নবকৃষ্ণের পক্ষে সমাজ-পতি হওয়া সহজেই সম্ভব হয়েছিল, যেমন আজও অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়।

১৩৭১ | ১৯৬৪

ঠাকুর পরিবারের আদিপর্ব ও সেকালের সমাজ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গৃহপ্রবেশ উৎসবের সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর 'অনেক অনেক ভাগ্যবান' সাহেব-বিবিদের নিমন্ত্রণ করে এনে 'চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য' ভোজন করিয়ে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। কলকাতা শহরের বাঙালী ভাগ্যবানেরাও উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের সংখ্যা পাথুরিয়াঘাটা শোভাবাজার বাগবাজার হাতীবাগান কুমোরটুলি বৌবাজার অঞ্চলে তখন খুব কম ছিল না। বড়-বড় দেওয়ান বেনিয়ান মুচ্ছুদ্দী ব্যবসায়ী, নিমকমহল ও হাটবাজারের ইজারাদার ও রাজামহারাজা খেতাবধারীদের সমাগম হয়েছিল উৎসবে। দ্বারকানাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী রামমোহন রায়েরও তখন (১৮২৩ সালে) কলকাতায় থাকার কথা, যদিও 'ব্রাহ্ম সমাজ' তখনও স্থাপিত হয়নি এবং 'ইউনিটেরিয়ান সভা' নিয়ে তিনি ব্যস্ত। উৎসবে রামমোহনও আসতে পারেন, তবে তিনি এসেছিলেন কি না সে-খবর তখনকার কোনো সংবাদপত্রে ছাপা হয়নি। একদিকে সাহেব-বিবিদের, আরএকদিকে অভিজাত বাঙালীদের ট্রাউজার-জ্যাকেট-টুপি এবং চোগা-চাপকান-শিরস্ত্রাণাদি সাজসজ্জার বাহারে উৎসব সভা যে কি বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল তা-ও আজ মানসনেত্রে দেখা ছাড়া উপায় নেই, কারণ কোনো শিল্পী তৈলচিত্রে তা রূপায়িত করেননি, এবং আলোকচিত্রেও তা ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। স্বচ্ছন্দে কল্পনা করা যেতে পারে যে সেদিন চিৎপুর-অঞ্চল ল্যাণ্ডো-ফিটন-ব্রউহাম-পাল্কিগাড়ি ও ঘোড়ার ভিড়ে দুর্গম হয়ে উঠেছিল এবং সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে

দিলেও, বিচিত্র বেশধারী কোচওয়ান সহিস খিদ্‌মৎগার মশাল্‌চিদের সমাবেশেই জোড়াসাঁকো সরগরম হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটা সাধারণ নয়, 'Prince' দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব।

উৎসবের দিন ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩০ সাল, ইংরেজি ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার। উৎসবের সময় সন্ধ্যার পরে। আলোকসজ্জা ও আতসবাজীর জন্য সন্ধ্যার পরই প্রশস্ত সময়। সাহেবী, বাঙালী ইত্যাদি খানার 'চতুর্বিধ ভোজনীয় দ্রব্যের' বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়নি। শুধু এইটুকু জানা যায় যে ভোজনান্তে উত্তম গান, ইংরেজী বাদ্য ও নৃত্য হয়েছিল। তারপর ভাঁড়েরা সং সেজে উপস্থিত সাহেবলোক ও বাবুদের প্রচুর আমোদ বিতরণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে একজন গো-বেশ ধারণ করে ঘাস চর্বণ করাতে আমন্ত্রিতদের আহ্লাদের আর সীমা ছিল না।[১]

জোড়াসাঁকোর নবনির্মিত গৃহে প্রবেশ করার আগে দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষরা কলকাতার আরও অনেক গৃহে প্রবেশ করে বাস করেছিলেন। কেবল চিৎপুরে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে নয়, তার বাইরে বর্তমান ধর্মতলা এসপ্লানেড ও ময়দান অঞ্চলে, যখন ময়দানের নতুন কেল্লা জুড়ে গঙ্গার তীর ধরে ছিল অধুনালুপ্ত গোবিন্দপুর গ্রাম। যোব চার্নক সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকে কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন গঙ্গার পূর্বতীরে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সিদ্ধান্ত করে। তার আগেই অবশ্য বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা আরও উত্তরে বড়বাজারের কাছে সুতাবস্ত্রের হাট বসিয়েছিলেন, যার জন্য অঞ্চলটার নামই 'সুতানুটি' হয়েছিল। পশ্চিমতীরে পর্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত বেতোড়ের হাট, পূর্বতীরে শেঠ-বসাকদের সুতানুটি হাট, কাজেই চার্নকের পক্ষে কুঠির জন্য পূর্বতীর বেছে নেওয়া ভুল হয়নি। গোবিন্দপুর গ্রাম তারও আগে থেকে ছিল কিনা সঠিক জানা যায় না। মনেহয় পূর্বতীরে সুতানুটি হাট আর চার্নকের কুঠি স্থাপিত হবার পর থেকে ভাগ্যান্বেষী বাঙালিরা কিঞ্চিৎ অর্থের ধান্ধায় পাশাপাশি গ্রাম থেকে এসে গঙ্গাতীরেই বাসা বেঁধেছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি বসতির সমাবেশে সেখানে একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল। বাংলা দেশের গ্রামের বসতি সাধারণত কোনো দেবতা ও দেবালয় কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হয়, তাই গ্রামদেবতা গোবিন্দের নামে গ্রামের নাম হয় গোবিন্দপুর।

কলকাতা মহানগর তখন এইরকম কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গ্রামের গর্ভে অঙ্কুরাবস্থায় ছিল। ইংরেজ বণিকের আগমনের ফলে তার ভবিষ্যৎ রূপ যাঁরা সেদিন মনশ্চক্ষুতে কিছুটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'ব্ল্যাক-জমিদাব' বলে খ্যাত গোবিন্দরাম মিত্র, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পিতা দেওয়ান রামচন্দ্র দেব প্রভৃতি অন্যতম। জোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে তিনি আরও অনেকের মতো বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে এসেছিলেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে, ইংরেজের বাণিজ্যকুঠির অদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। তারপর বংশানুক্রমে অনেক বুদ্ধি ও কৌশল খাটিযে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন, কত চাকরি আর কতবকমের বাণিজ্য যে করেছেন তার ঠিক নেই। তবেই ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়েছেন তাঁদের প্রতি এবং সেই প্রসন্নতা-পরিবৃত পরিবেশে গোপীমোহন চন্দ্রকুমার প্রসন্নকুমার দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার বিচিত্র বিকাশ হয়েছে ঠাকুরপরিবারে। পরবর্তীকালের বংশধরদের বিচিত্রগামী প্রতিভার জৌলুসে ঠাকুরপরিবারের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি স্বভাবতই ম্লান হয়ে গেছে এবং তাঁদের কীর্তিকলাপও মনে হয়েছে বিস্মরণীয়। কিন্তু তবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পিতৃপুরুষদের প্রত্যহ স্মরণ করতেন এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে[২]

পুরুষোত্তমাদ্বলরামঃ বলবামাদ্ধরিহরঃ
হরিহরাদ্রামানন্দঃ রামানন্দান্মহেশঃ
মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ
জয়রামান্নীলমণিঃ নীলমর্ণেরামলোচনঃ
রামলোচনাদ্দারকানাথঃ,
নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

পুরুষোত্তম থেকে বলরাম, বলরাম থেকে হরিহর, হরিহর থেকে রামানন্দ, রামানন্দ থেকে মহেশ, মহেশ থেকে পঞ্চানন, পঞ্চানন থেকে জয়রাম, জয়রাম থেকে নীলমণি, নীলমণি থেকে রামলোচন, রামলোচন থেকে দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত পিতৃপুরুষদের তর্পণ করতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রামলোচন জ্যেষ্ঠ এবং দ্বারকা-নাথকে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন বলে দ্বারকানাথের জনক রামমণির পরিবর্তে রামলোচনের নাম করা হয়েছে। দ্বারকানাথের জন্ম হয় আঠারো শতকের শেষ দশকে (১৭৯৪)। তার ঊর্ধ্বে চারপুরুষ পর্যন্ত ঠাকুরবংশের কেউ কলকাতায়

আসতে পারেন, কারণ কলকাতা শহরের তখন পত্তন হয়েছে, লোকজনের বসতি বেড়েছে এবং রোজগারের পথও অনেক খুলে গেছে। দ্বারকানাথ থেকে চারপুরুষেরও আগে ঠাকুরদের কারও কলকাতায় আসা সম্ভব নয়, কারণ তাহলে প্রায় চার্নকেরও আগে আসতে হয় এবং তা আসবার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না। পঞ্চানন-জয়রাম-নীলমণি-রামলোচন, এই হল দ্বারকানাথ ঠাকুরের ঊর্ধ্বতন চারপুরুষ। কাজেই আঠারো শতকের গোড়ার দিকে পঞ্চানন ঠাকুরকে আমরা দেখতে পাই গঙ্গাতীরের গোবিন্দপুর গ্রামে। কিন্তু এই ঠাকুর মহাশয়ের কথা শুরু করার আগে আরও কয়েকপুরুষ ঊর্ধ্বে পুরুষোত্তম-বলরাম পর্যন্ত কিছু বলা দরকার। মহর্ষি যখন পুরুষোত্তম পর্যন্ত স্মরণ করতেন তখন ঠাকুরপরিবারের ইতিহাসপ্রসঙ্গে তাঁদের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

পুরুষোত্তম হলেন দ্বারকানাথ থেকে ঊর্ধ্বতন দশম পুরুষ, রবীন্দ্রনাথ থেকে দ্বাদশ পুরুষ। সাধারণত আমরা সাতপুরুষের কথা উল্লেখ করে থাকি এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে সেই সাতপুরুষের মধ্যে প্রথম পঞ্চানন ঠাকুর একেবারে কলকাতা শহরে পদার্পণ করেছেন দেখা যায়। পঞ্চাননের আরও পাঁচপুরুষ আগে পুরুষোত্তম। একপুরুষে পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে গণনা করলে পুরুষোত্তমকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিয়ে যেতে হয়। তখন বাংলা দেশে হুসেনশাহী সুলতানদের পর শূরবংশীয় আফগান সুলতানদের রাজত্বকাল। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবে সমাজ ও সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনে তখন বাংলা দেশে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। পুরুষোত্তম মধ্যযুগে এই জাগরণকালের লোক।

বাংলা দেশে ঠাকুরবংশ 'পিরালী' ব্রাহ্মণবংশ বলে কথিত। পিরালীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কাহিনীর অন্ত-নেই। কুলাচার্য নীলকান্ত ভট্টের কারিকা থেকে জানা যায় যে সুলতানের একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ কর্মচারী নবদ্বীপের কাছে পিরলিয়া বা পিরল্যা গ্রামে বাস করতেন। এক সুন্দরী মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। পিরল্যা গ্রামে বাস করার জন্য অথবা মুসলমানপ্রীতির জন্য লোকে তাঁকে 'পিরালী' বলে ডাকত। এই কাহিনী যদি সত্যও হয় তাহলেও ঠাকুরবংশের সঙ্গে এই প্রেমিক পিরালীর কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না, কারণ এই পিরালী যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে

তাঁর বংশ ব্রাহ্মণবংশ বলে কথিত হতে পারে না।

অন্য কুলাচার্যদের কারিকায় দেখা যায় যে হুসেন শাহের আমলে জনৈক হিন্দু দেওয়ান যবনের খানা ঘ্রাণের জন্য, ঘ্রাণে অর্ধভোজন 'থিয়োরি' অনুযায়ী মুসলমানী খানা আস্বাদনের অপরাধে সমাজচ্যুত হন :

যবনের খানার ঘ্রাণ গেল তোমার নাকে।
কেমনে রইল হিন্দুয়ানী কহত আমাকে॥
বাদশার কথায় জব্দ দেওয়ান লোকে পাইল ভান।
সমাজেতে রাষ্ট্র হইল খানা খায় দেওয়ান॥
পীরের থৈইকা পাইল দোষ নাম হইল পিরারী।
সংস্রবেতে দোষী পিঠাভোগেব কুশারি॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' আছে

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে।
বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে॥

পিরালী ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম আরও অনেক কারিকা, ছড়া ও কবিতা উদ্ধৃত করা যায়। কিন্তু এইসব কাহিনী থেকে যে ঐতিহাসিক সত্যেব ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার সঙ্গে কারিকার বা কিংবদন্তীর কাহিনী-কল্পনার সম্পর্ক খুব সুদূর। আসল সত্য এই হওয়া সম্ভব যে, সুলতানী আমলে বাংলার মুসলমান শাসকরা তুর্কীয়ানা পদ্ধতিতে যখন দেবদেউল ধ্বংস ও জাতিধর্ম নাশ করছিলেন তখন নবদ্বীপ ও তার পরিপার্শ্বের একাধিক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের উপর দিয়েও সেই ঝড় বয়ে গিয়েছিল। তারপর সেই বিপর্যস্ত গ্রামের ব্রাহ্মণরা আবার হিন্দুসমাজের কাছেও কঠোর দণ্ড পেয়েছিলেন। তখন সমাজে কেবল বৈষ্ণবধর্মের উদারতার বাণীই যে ঘোষিত হচ্ছিল তা নয়, রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত ভট্টাচার্যেরাও রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করে, নব্য-স্মৃতি হাতে নিয়ে তর্জনী তুলে অনাচার-অত্যাচারপীড়িত হিন্দুসমাজকে শাসাচ্ছিলেন। সামাজিক অবস্থা যা হয়েছিল তাতে স্মার্ত পণ্ডিতদের শাসানিকেও দোষ দেওয়া যায় না। তাঁরা ভেবেছিলেন যে মুসলমানদের অত্যাচারে অনর্গল ধারায় অনাচার প্রবেশ করছে সমাজে এবং সমাজ রসাতলে যাচ্ছে। কাজেই স্মৃতি-ধর্মশাস্ত্রের বজ্রবন্ধনে তাঁরা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছিলেন।

বজ্র আঁটুনির ফলে গেরো ফস্কা হয়েছিল কিনা তা সামাজিক ইতিহাসের বিচার্য বিষয়, আপাতত ঠাকুরপরিবারের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। লক্ষণীয় হল, এইসময় কুলাচার্যরাও সোৎসাহে কুলগ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সকলেরই কুলপঞ্জী তৈরি হয়। মুসলমানদের অত্যাচারে অথবা মুসলমান শাসকদের দরবারে রাজকার্য উপলক্ষে ঘনিষ্ঠতার জন্য যেসব ব্রাহ্মণ ভট্টাচার্যদের বিচারে জাতিচ্যুত করা হয়েছিল, মনেহয় তাঁদের মধ্যে 'পিরালী ব্রাহ্মণরা' অন্যতম। হিন্দুসমাজের বিচারে যবন-সাহচর্যের ফলে গ্রামকে-গ্রাম দণ্ডিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। নবদ্বীপের কাছে পিরল্যাবাসী ব্রাহ্মণরা এইভাবেও দণ্ডিত হতে পারেন।

কলকাতার ঠাকুরপরিবার, কুলাচার্যদের মতে, যশোহর-খুলনার পিঠাভোগের কুশারী-বংশজাত। কুশারীরা তাঁদের বর্ধমান জেলার আদিনিবাস কুশগ্রাম থেকে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ও যশোহর-খুলনা জেলার ঘাটভোগ, দামুড়হুদা, পিঠাভোগ প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েন। পুরুষোত্তমের পিতা জগন্নাথ কুশারী আদিপিরালী শুকদেবের কন্যাকে বিবাহ করে যশোহর জেলায় বসবাস করেন। জগন্নাথের বংশধররা এইভাবে পিরালী ব্রাহ্মণদের থাকভুক্ত হন।[৩] জগন্নাথ কুশারীর কাল ষোড়শ শতকের প্রথমপর্ব, পুরুষোত্তমের কাল মধ্যপর্ব। উভয়েই মুসলমান রাজত্বের মধ্যাহ্নকালের লোক।

পুরুষোত্তমের পুত্র বলরাম, পৌত্র হরিহর, প্রপৌত্র রামানন্দ। রামানন্দের পুত্র মহেশ্বর থেকে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উৎপত্তি। মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন সর্বপ্রথম কলকাতায় আসেন এবং বংশলতা অনুসারে তাঁর আগমনকাল আঠারো শতকের প্রথম পর্ব অনুমান করতে বাধা নেই। ১৭০৭ সালে যখন সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয় তখন কলকাতা অঞ্চল জরিপ করে দেখা যায় যে 'বাজার-কলকাতা' অঞ্চলে মোট প্রায় ৫০০ বিঘার মধ্যে কমপক্ষে ৪০০ বিঘায় লোকজনের বসতি ও ঘরবাড়ি আছে, কিন্তু 'টাউন-কলকাতা' অঞ্চলে প্রায় ১৭০০ বিঘার মধ্যে মাত্র ২৫০ বিঘা, 'সুতানুটি' অঞ্চলে ১৭৭০ বিঘার মধ্যে মাত্র ১৩৪ বিঘায় এবং 'গোবিন্দপুর' অঞ্চলে ১২০০ বিঘার মধ্যে মাত্র ৫৭ বিঘায় লোকবসতি আছে, বাকি সব ধানক্ষেত, কলাবাগান, বাঁশবাগান, পুকুর ও জলাজঙ্গলে ভর্তি।[৪] তবু বাজার-কলকাতার (বর্তমান বড়বাজার প্রভৃতি অঞ্চল) বসতির ঘনত্ব দেখে

বোঝা যায় যে আঠারো শতকের গোড়ার দিকেই শহরের আকর্ষণ বেশ বেড়েছিল, অন্তত আর্থিক আকর্ষণ তো নিশ্চয়ই। তা না হলে বাজার অঞ্চলে লোকের ভিড় হবে কেন? সুতানুটি (বর্তমান উত্তর-কলকাতা), টাউন-কলকাতা (বর্তমান মধ্য-কলকাতায় বৌবাজার প্রভৃতি অঞ্চল) ও গোবিন্দপুরে (বর্তমান ময়দানে কেল্লার কাছে) লোকবসতি আদৌ ঘন হয়নি। আগেই বলেছি, বাজার-কলকাতা অঞ্চলে বাঙালী তন্তুবণিক শেঠ-বসাকরা (মুর্শিদাবাদের জৈন ব্যাঙ্কার শেঠরা নন) আগে থেকে বাজার পত্তন করেছিলেন, সেই কারণে এই অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় লোকবসতি বেশ বেড়েছিল।[৫] এদেশের লোক, প্রধানত বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়, ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই বাজার অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাহলেও গোবিন্দপুর গ্রামের আকর্ষণও তখন কম ছিল না, কারণ গঙ্গাতীরে ইংরেজদের পুরাতন কুঠি ও কেল্লা গোবিন্দপুরের কাছেই অবস্থিত ছিল (বর্তমান কাস্টমস হাউস ও বড ডাকঘরের কাছে)। কলকাতা শহরের মূলকেন্দ্র (nucleus) ছিল এই পুরাতন কুঠি-কেল্লা অঞ্চল, এবং এই কেন্দ্রটিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে বেষ্টন করে গোবিন্দপুর থেকে সুতানুটি পর্যন্ত মৌচাকের মতো লোকবসতি গড়ে উঠেছিল। ১৭০৫-৬ সালে দেখা যায়, কোম্পানির কর্মচারীরা কলকাতার খবর জানিয়ে বিলেতে ডিরেক্টরদের লিখছেন—'The Towne buildings increased and the Streets regular'—এবং তার চেয়েও বড় সুসংবাদ দিচ্ছেন এই বলে যে 'people flocking there to make the Neighbouring Jemindars envy them'—অর্থাৎ দলে-দলে লোক শহরে আসছে এবং তাই দেখে আশপাশের জমিদাররা বেশ ঈর্ষা প্রকাশ করছেন।[৬]

পঞ্চানন ঠাকুর যদি এইসময় কলকাতায় আরও অনেকের মতো ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এসে থাকেন তাহলে যথাসময়েই এসেছিলেন বলতে হবে। বাজার কলকাতায় যেমন প্রধানত বণিকজাতির বাস ছিল, তেমনি গোবিন্দপুরে মনেহয় প্রধানত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মধ্যবিত্তরা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কুশারীবংশীয় ব্রাহ্মণ বলেও পঞ্চানন গোবিন্দপুরে বাস করা বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারেন। এ-ছাড়া সাহেবদের কুঠি, কেল্লা, মালগুদাম ও জাহাজঘাট কাছে বলেও তাঁর গোবিন্দপুরে বাস করার ইচ্ছা হতে পারে। শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পিতা, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, এঁরা পঞ্চাননের সময়ে, কিছু আগে বা

পরে, কলকাতার গোবিন্দপুর অঞ্চলে এসেছিলেন। অর্থ উপার্জনের জন্য যাঁরা তখন কলকাতায় আসতেন তাঁরা হয় কোম্পানির কলকাতার জমিদারীর কাজকর্ম, না হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। কাপড়চোপড় ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা তখনও কুলবৃত্তি হিসেবে প্রধানত বিভিন্ন বণিকজাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা তখন জায়গাজমির পত্তনি, বাজারঘাট ও নিমকমহলের ইজারাদারী, জাহাজের বিদেশী নাবিক ও লস্করদের জিনিসপত্তর সরবরাহ অথবা বেনিয়ানগিরি করতেন। পঞ্চানন এর মধ্যে জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসীদের মাল-সরবরাহের কাজটি বেছে নিয়েছিলেন শোনা যায়। এতে বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার হত এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন ধরার জন্য ব্যবসায়ীদের যে আগ্রহ প্রকাশ পেত তাই থেকে নাকি পরে 'কাপ্তেন পাকড়াও' কথা শহরে চালু হয়েছে এবং শহরের বাবুরাও 'কাপ্তেন' নামে অভিহিত হয়েছেন। ইংরেজ ক্যাপ্টেন, খালাসী ও বণিক মহলে পঞ্চানন 'ঠাকুর' বলে পরিচিত হন। আমাদের দেশে সাধারণ লোক ব্রাহ্মণকে 'ঠাকুর মশাই' বলে সম্বোধন করে থাকেন। গোবিন্দ-পুরের সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে পঞ্চানন কুশারীর 'ঠাকুর মশাই' নামটি ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং এই 'ঠাকুর' কথাটি ইংরেজদের মুখে 'Tagore' হয়ে যায়। এর মধ্যে কতটুকু কাহিনী আর কতটুকুই বা ইতিহাস তা বলা কঠিন। তবে পঞ্চাননের কালের দিক থেকে বিচার করলে কলকাতা শহরে তাঁর পেশা ও পদবীর রূপান্তর কোনটাই খুব অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না।

'পঞ্চাননাজ্জয়রামঃ জয়রামান্নীলমণিঃ।' পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কলকাতায় ইংরেজদের জমিদারী কাছারীতে কাজ করতেন। কলকাতা কলেক্টরেটের দলিলপত্রে কোথাও জয়রামের নাম পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। কলকাতার জমিদারীতে তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অসাধারণ প্রতিপত্তি, ইংরেজের অধীনে 'ব্ল্যাক ডেপুটি' হিসেবে আসলে তিনিই জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর প্রতাপে কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের লোক কাঁপত, 'গোবিন্দরামের ছড়ি' প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। কাছারীতে এদেশের লোক নায়েব, গোমস্তা, আমিন, রাজস্ব-আদায়কারী প্রভৃতি নানা রকমের চাকরি পেতেন। জয়রাম গোবিন্দরামের সমসাময়িক ছিলেন বলে মনেহয় তাঁর পক্ষে কলকাতার জমিদারী কাছারীতে কোনো কাজে নিযুক্ত থাকা অসম্ভব নয়। পলাশীর যুদ্ধের

বছর-খানেক আগে ১৭৫৬ সালে (ফারেল সাহেব ১৭৬২ সাল বলেছেন) জয়রামের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুকালে দুই স্ত্রী, তিন পুত্র—দর্পনারায়ণ নীলমণি ও গোবিন্দরাম—এবং পৌত্ররা জীবিত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্লোকে কেবল 'জয়রামান্নীলমণিঃ' এবং 'নীলমর্ণেরামলোচনঃ' উল্লেখ করা হয়েছে, দর্পনারায়ণের নাম নেই। পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঠাকুরপরিবারে দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের শাখা নীলমণি থেকে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি শাখাকে দর্পনারায়ণের শাখা, আর একটিকে নীলমণি ঠাকুরের শাখা বলা যায়। দেবেন্দ্রনাথ এই কারণে জয়রাম-নীলমণি-রামলোচন-দ্বারকানাথের নাম পিতৃ-পুরুষের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। দর্পনারায়ণেব শাখাকে পাথুরিয়াঘাটার এবং নীলমণির শাখাকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবার বলা হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর পুরাতন কেল্লা তুলে দিয়ে নতুন কেল্লা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। তার জন্য গোবিন্দপুর গ্রাম দখল করে স্থানীয় লোকজনদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে শহরের অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার ইংরেজ কর্তারা কোম্পানির ডিরেকটরদের লেখেন: 'আমরা গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে 'নেটিব' বাসিন্দাদের অন্যত্র তুলে দিতে বাধ্য হয়েছি, কারণ নতুন কেল্লা এই স্থানে তৈরি করা হবে ঠিক হয়েছে। ইটের পাকাবাড়ির মালিক যাঁরা তাঁদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলা হয়েছে। যাঁরা কাঁচা চালাঘরে থাকতেন তাঁদের অন্যত্র বসবাসের জমি দেওয়া হয়েছে এবং স্থানান্তরের খরচ বাবদ কিছু নগদ টাকাও দেওয়া হবে জানানো হয়েছে।'[৭] এই খবরটুকু ছাড়া গোবিন্দপুরের বাসিন্দারা কে কত জায়গাজমি ও নগদ টাকা পেয়েছিলেন, দলিলপত্র থেকে তা জানা যায় না। তবে ক্ষতিপূরণের জন্য উৎখাত বাসিন্দাদের যে অনেকদিন ধরে বোর্ডের কাছে লেখালেখি করতে হয়েছিল, সরকারী নথিপত্রের বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়।[৮] জয়রাম ঠাকুর গোবিন্দপুরের ভদ্রাসন রেখেই গত হয়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু দর্পনারায়ণ ও নীলমণি তা ছেড়ে আসার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে কত ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোথাও তার উল্লেখ নেই। তাঁদের বসতবাড়ি পাকা ছিল কিনা, এবং থাকলেও কত বড় ছিল তা অনুমান করা সম্ভব নয়। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে নগেন্দ্রনাথ বসু পিরালী ব্রাহ্মণ খণ্ডে ঠাকুরবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে জয়রাম মৃত্যুকালে ধনসায়েরের বাড়ি বাগান পুষ্করিণী বৈঠকখানা ব্যতীত নগদ টাকাও অনেক

রেখে যান। কিন্তু এই উক্তির কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ তিনি দেননি। ধনসায়েরই বা কোথায়? ধর্মতলা? আঠারো শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় ধর্মতলা অঞ্চলে 'ধনসায়ের' নামে কোনো জায়গা ছিল বলে জানা যায় না। ভদ্রাসনের নাম হতে পারে, 'সায়র' বা সরোবর-দীঘি হতে পারে, কিন্তু তারই বা প্রমাণ কি? ১৭৫৭ সালের শেষে গোবিন্দপুরের বসতি তুলে দেওয়া হয়, কারণ এই বিষয়ে কোম্পানির কাছে লেখা পূর্বোক্ত চিঠির তারিখ ১০ জানুয়ারি ১৭৫৮। জয়রামের মৃত্যুর অল্পদিন পরের ঘটনা। কাজেই দর্পনারায়ণ ও নীলমণি যদি কোনো বসতবাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়ে থাকেন তাহলে সেটা গোবিন্দপুরে হওয়াই সম্ভব। এই সময় শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ, কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র এবং আরও অনেক দর্পনারায়ণ নীলমণির সমসাময়িক ব্যক্তি উত্তর কলকাতায় সূতানুটি অঞ্চলে নতুন ভদ্রাসন নির্মাণ করে গোবিন্দপুর থেকে উঠে আসেন।

ঠাকুরদের মধ্যে দু'জন অবশ্য কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন কোম্পানির কাছ থেকে, কিন্তু সেটা মনে হয় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে কলকাতায় ইংরেজদের যুদ্ধের ফলে (১৭৫৬) যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল তারই পূরণস্বরূপ। যাঁরা এই ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিখ্যাত পিতা-পুত্র গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘু মিত্র (প্রায় ৪ লক্ষ টাকা পান, শোভারাম বসাক (প্রায় ৪ লক্ষ), রতু (রতন) সরকার (প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার), শুকদেব মল্লিক ও নয়ান মল্লিক (প্রত্যেকে প্রায় ৪০ হাজার), নীলমণি ও হরিকিষণ ঠাকুর (যথাক্রমে ১৮ হাজার ও ১০ হাজার)।* হরিকিষণ ঠাকুর নীলমণি ও দর্পনারায়ণের ভাই হতে পারেন। বংশলতায় সব নাম নেই ঠাকুরবংশের এমন অনেক নাম পুরাতন দলিলপত্রে পাওয়া যায়

১৭৫৮-৫৯ সালে কোনো সময় দর্পনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুর উত্তর কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠা করে বাস করতে আরম্ভ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু কয়েকটি দলিল (বিক্রয়-কোবলা, পাট্টা ইত্যাদি) উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে ১৭৬৪ সালে নীলমণি ঠাকুর সূতানুটি গ্রামে কলকাতা কালেক্টরির জদজমি থেকে দু'বিঘে তের কাঠা জমি সালিয়ানা ৭৸৶০ গণ্ডা সিক্কামুদ্রা খাজনায় পাট্টা করে নেন। এর কয়েকমাস পরে তিনি ডিহি কলকাতার প্রান্তে জনৈক রামচন্দ্র কলুর কাছ থেকে ৫২৫ টাকায় ঘরবাড়িসহ সাড়ে দশকাঠা জমি

নিজের নামে কেনেন। তারপর ১৭৬৯ সালে এইসব জমির সংলগ্ন আরও দু'বিঘে সাত কাঠা জমি বসতবাড়িসহ তিনি জনৈক জগমোহন সাহার কাছ থেকে ৯০০০ টাকায় কেনেন। এইসব জমি জুড়ে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুর-পরিবারের বাসস্থান গড়ে ওঠে।

এই সময় পাথুরিয়াঘাটায় দর্পনারায়ণ ও নীলমণি ঠাকুরের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও, সমাজে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে হয় না। ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরিবাকরি করে তাঁরা তখন পর্যন্ত হয়ত প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেননি। কারণ ১৭৬০ সাল থেকে ১৭৭০-৭৫ সাল পর্যন্ত দর্পনারায়ণ বা নীলমণির নাম কোনো সরকারী নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল পূর্বোক্ত ক্ষতিপূরণের তালিকায় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৭৫৮) হরিকিষণ 'Tagoor'-এর সঙ্গে 'নীলমণি' নামটি ছাড়া। অথচ ১৭৬০ সাল থেকে দলিলপত্রে বিবিধ প্রসঙ্গে একাধিক ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, যেমন ভবানীচরণ ঠাকুর, শিবনারায়ণ ঠাকুর, দয়ারাম ঠাকুর, হরিকিষণ ঠাকুর, কেবলরাম ঠাকুর ইত্যাদি। চব্বিশ পরগণার জমিদারী নিয়ে ইংরেজরা যখন টাউনহলে নিলাম ডেকে তার ইজারা দেন তখন ভবানীচরণ ঠাকুর (বলরাম বিশ্বাসের সঙ্গে) পিচাকুলির জমিদারী ৩৩,৪০০ টাকায় ডাক দিয়ে কেনেন (৩১ জুলাই ১৭৬০)।[১০] গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্র কোনো প্রতারণার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখনকার ইংরেজদের দণ্ডনীতির সঙ্গে আমাদের দেশীয় দণ্ডনীতির গুরুতর পার্থক্যের ফলে সমাজে রীতিমত বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি তার বড় দৃষ্টান্ত। রাধাচরণের ফাঁসির হুকুম হলে কলকাতার সম্ভ্রান্ত বাঙালী ও অবাঙালী বাসিন্দারা দণ্ড মকুব করার জন্য আবেদন করেছিলেন (২৯ জানুয়ারি ১৭৬৬)। আবেদনপত্রের ৯৫ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে পূর্বের ভবানী-চরণ ছাড়া বাকি ছ'জন ছিলেন ঠাকুরবংশের।[১১] এঁদের মধ্যে নীলমণি বা দর্পনারায়ণ কারও নাম না থাকাতে মনে হয় যে ঠাকুরগোষ্ঠীর মধ্যেই এই দুই ভাই প্রধান হয়ে ওঠেননি।

১৭৭৫-৭৬ সাল থেকে বিভিন্ন নথিপত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুরের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে তখন তিনি যে খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নীলমণি ঠাকুর ব্যবসায়ী ছিলেন না, থাকলেও

তাঁর ভাইয়ের মতো প্রতিষ্ঠা পাননি। মনে হয় সরকারী জমিদারী বিভাগে অথবা কোনো বাণিজ্যকুঠিতে তিনি বাঁধা মাইনের চাকরি করতেন। নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে নীলমণি সেরেস্তাদারের কাজ করতেন এবং ওড়িশায় থাকতেন। তা হতে পারে এইজন্য যে দর্পনারায়ণের সমসাময়িক দলিলে ব্যবসাবাণিজ্য অথবা বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে কোথাও নীলমণি ঠাকুরের নাম নেই। দর্পনারায়ণ কলকাতায় থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করতেন এবং নীলমণি বাইরে কোম্পানির জমিদারীতে চাকরি করতেন, একথা সত্য বলেই মনে হয়।

বৈদেশিক বিভাগের নথিপত্রে দর্পনারায়ণ ঠাকুর—**'Who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time'**—বলা হয়েছে।[১২] কিন্তু এইটুকু তাঁর যথেষ্ট পরিচয় নয়। কলকাতার 'রেভিনিউ কমিটি', 'রেভিনিউ বোর্ড' এবং সম্পত্তির 'লীজ-ডীডেব' দলিলপত্র থেকে তাঁর বিষয় যা জানা যায় তাতে মনেহয় রামদুলাল দে-সরকার, মদন দত্ত প্রভৃতির মতো তিনি সেকালে অসাধারণ কর্মী পুরুষ ছিলেন। কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে 'বেনিয়ান', কোথাও **'merchant of Calcutta'**, কোথাও বা নিমক ও বাজারের ইজারাদার ও জমিদারীর পত্তানদার। জানবাজার অঞ্চলে দর্পনারায়ণ অনেক ভূ-সম্পত্তি কিনেছিলেন, সেখানে বেশ বড় বাজার বসিয়েছিলেন।[১৩] চব্বিশ-পরগণার নিমকের এজেণ্টদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।[১৪] নদীয়ার কৃষ্ণনগরের মহারাজা শিবচন্দ্রকে একবার তিনি, বারাণসী ঘোষ ও রামশঙ্কর হালদার মিলে বকেয়া সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করার জন্য প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছিলেন। সেই টাকা মহারাজা শিবচন্দ্র পরিশোধ করতে পারেননি বলে কমিটির কাছে তাঁরা আবেদন করেছিলেন যে তাঁর মাসহারা থেকে মাসিক কিস্তিতে যেন ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং কমিটি আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন।[১৫] চব্বিশ-পরগণার বড় বড় ইজারদারদের জামিন হতেন দর্পনারায়ণ, আর্থিক জগতে তাঁর এত সুনাম ও প্রতিপত্তি ছিল।[১৬] এত বড় কর্মী পুরুষ যিনি ছিলেন তাঁকে শুধু হুইলার সাহেবের দেওয়ান ও পে-অফিসের কর্মচারী বলে পরিচয় দিলে কিছুই বলা হয় না। বিষয়-সম্পত্তিও কলকাতায় তিনি যথেষ্ট কিনেছিলেন। রাধাবাজার, তালতলা বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর সম্পত্তিও ছড়িয়ে ছিল।[১৭] এ-ছাড়া পরগণা উত্তর শ্রীপুরে

(রাজশাহী জমিদারীর অধীন) বাৎসরিক ১৩,০০০ টাকা নীট আয়ের প্রায় ২৪৯ বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট জমিদারীও তিনি ৯১,৫০০ টাকায় কিনেছিলেন।[১৮]

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের সাতপুত্রের মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুরের বৈষয়িক বুদ্ধি পিতার মতনই প্রখর ছিল। তখনকার দিনে কলকাতার বৈঠকখানা বাজার, তালতলা বাজার, ধর্মতলা বাজার, জানবাজার, মেছুয়াবাজার, সুতানুটি বাজার প্রভৃতি বাজার-হাট ইজারা নেওয়া, কোম্পানির অনুমতি নিয়ে (বিনা অনুমতিতেও) নতুন হাট-বাজার পত্তন করা, কলকাতা শহরের ধনবান লোকদের একটা বড় ব্যবসা ছিল। বাজার ইজারা নিয়ে অথবা পত্তন করে তাঁরা নানা-রকমের দোকান প্রতিষ্ঠার ও জিনিসপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা করে দিতেন, কোম্পানির কর্তাদের একটা নির্দিষ্ট টাকা দিতে হত, বাকি যা আয় হত তা তাঁরা নিজেরা ভোগ করতেন। গোবিন্দরাম মিত্র ও মহারাজা নবকৃষ্ণ থেকে রাধাকান্ত দেব, দর্পনারায়ণ ও গোপীমোহন ঠাকুর, মদন দত্ত, বারাণসী ঘোষ এবং আরও অনেকে কলকাতার বাজার থেকে বিলক্ষণ অর্থ উপার্জন করেছেন। দর্পনারায়ণের জানবাজারের কথা বলেছি, গোপীমোহন নতুন চীনাবাজারের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় ৫ বিঘে ১৯ কাঠা ১২ ছটাক জমির উপর একদা (১৭৭৫ সালে) একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয়েছিল, যাকে 'নিউ থিয়েটার' বলা হত। পরে জনৈক রোওয়ার্থ সাহেব সেখানে একটি নিলেমঠি স্থাপন করেন। ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপনে (১৮০৮ সাল) দেখা যায় যে এই বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি গোপীমোহন ঠাকুর কিনে নিয়েছিলেন নতুন বাজার প্রতিষ্ঠার জন্য —'Known by the name of the New China Bazar, most of the shop-keepers of the Old China Bazar having agreed to remove their shops to the above mentioned buildings on which very large investments and various other valuable articles have been purchased.' ১৮০৮ সালের ২০ নভেম্বর এই নতুন চীনাবাজার খোলা হবে বলে পত্রিকায় 'নোটিস' দেওয়া হয়েছিল এবং জানানো হয়েছিল যে সেখানে 'Europe and other articles of every description will be found for sale.'[১৯] গোপীমোহন এই চীনাবাজারের জন্য কতটা পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেছিলেন এবং কতটাকা মুনাফা করতেন তার হিসেব না পাওয়া গেলেও কল্পনা করতে বাধা নেই।

নীলমণির ক'জন পুত্র ছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ নামে তাঁর তিন পুত্র ছিল (নগেন্দ্রনাথ বসু ও ফারেল)। কারও মতে তাঁর পাঁচ পুত্র ছিল—রামতনু, রামরতন, রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ।[২০] কলকাতার বিষয়সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারে রামরতন ঠাকুরের নাম পুরাতন লীজ-ডীডের দলিলে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর অন্য কোনো ভাইদের, অর্থাৎ নীলমণির অন্য কোনো পুত্রদের বৈষয়িক খবর কিছু পাওয়া যায় না।[২১] এতে মনেহয় যে বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য দর্পনারায়ণ নিজে ও তাঁর পুত্ররা অন্তত কলকাতা শহরে যতটা উদ্‌যোগী ছিলেন, নীলমণি বা তাঁর পুত্ররা তা ছিলেন না। নিমকের এজেন্সি, দেওয়ানী বা বেনিয়ানী, কলকাতার হাটবাজারের ইজারাদারী অথবা এই ধরনের কাজকর্ম করে যদি তাঁরা প্রতিষ্ঠা পেতেন তাহলে রেভিনিউ কমিটি বা রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্রে কোথাও তাঁদের নামের উল্লেখ থাকত।

নীলমণি ওড়িশায় সেরেস্তাদারের চাকরি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে কলকাতায় যথেষ্ট ভূসম্পত্তি কিনেছিলেন, একথা নগেন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কলকাতায় থাকতেন না বলে তাঁর ভাই দর্পনারায়ণকে পারিবারিক কর্তব্য পালন করতে হত। উপার্জিত অর্থ নীলমণি তাঁর ভাইয়ের কাছে কিছু গচ্ছিত রাখতেন। দুই ভাই এইভাবে যখন নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করছিলেন তখন ঘটনাচক্রে তাঁরা এক পারিবারিক সংকটের সম্মুখীন হন। সংকট ঘনিয়ে ওঠে তাঁদের পরলোকগত ছোটভাই গোবিন্দরামের বিধবা পত্নী রামপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পৃথক হবার ইচ্ছা থেকে। সম্পত্তি বিভাগের জন্য তিনি সুপ্রীমকোর্টে নালিশ করেন। তার ফলে একান্নবর্তী ঠাকুরপরিবার তিনটি শাখায় ভাগ হয়ে যায়, দর্পনারায়ণ ও নীলমণিও ভিন্ন হতে বাধ্য হন। পাথুরিয়াঘাটার বাড়ি ও পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন দর্পনারায়ণ, আর নীলমণি নিজের অংশের বদলে নগদ একলক্ষ টাকা নিয়ে মিটমাট করে নেন। পৈতৃক বিগ্রহের মধ্যে দর্পনারায়ণ রাধাকান্তের সেবার ভার পান এবং নীলমণি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কলকাতার আদিবাসিন্দা শেঠ-বসাকদের বিস্তীর্ণ বাগান ছিল উত্তর-কলকাতায়। এই বাগানকেই 'জোড়াবাগান' বলা হত। নতুন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নীলমণি

ঠাকুর শেঠবংশীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণের কাছ থেকে জোড়াসাঁকো অঞ্চলে বাসের জমি লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ সালের জুনমাস থেকে জোড়াসাঁকোর ভদ্রাসনে নীলমণি-শাখার ঠাকুর পরিবারের বাসের সূত্রপাত হয়।[২২] জোড়াসাঁকো অঞ্চল তখন মেছুয়াবাজারের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু জোড়াসাঁকো নামটিও তার কম প্রাচীন নয়। গ্রাম্যজীবনকালেই এখানে পুষ্করিণী বা নালার উপর দিয়ে যাতায়াতের জন্য একজোড়া সাঁকো ছিল বলে স্থানীয় লোকের কাছে 'জোড়াসাঁকো' নামে তা পরিচিত ছিল। এইকারণে এরকম পরিচয় গ্রামাঞ্চলে এখনও অনেক স্থানের আছে। উইলসনের বিবরণ থেকে মনেহয় যে শেঠদের যে পুরাতন বাগান ছিল এই অঞ্চলে তার নাম ছিল 'জোড়া বাড়ি বাগ'। অর্থাৎ একজোড়া বাড়িসহ বাগান ছিল এবং তার জন্যই অঞ্চলটির নাম হয়েছিল 'জোড়াবাগান'।[২৩] ১৭৪২ সালে ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেণ্ট ও গবর্নরের কাছে সেনাবিভাগ থেকে একটি রিপোর্ট দাখিল করা হয় কলকাতা শহরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য। তাতে কলকাতার নগর এলাকার মধ্যে সাতটি অঞ্চলে কামান স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। তার মধ্যে শেঠদের জোড়াবাগানে ছয় কামানের একটি ব্যাটারি স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কলকাতা শহরের কয়েকটি অতিপ্রাচীন মানচিত্র ও নক্সা আছে। তার মধ্যে একটি নক্সায় (*Plan of Calcutta*, by Forresti and Clifers, 1742) পঞ্চম ব্যাটারির উল্লেখ আছে 'Batarie Zora Sako' বলে। উইলসন বলেছেন, 'It is placed at what is now the junction of the Chitpur Road with Ratan Sircar Street, near Lala Babu's Bazar, below the Jora Sanko Police Station.' এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে ১৭৪২ সালে তো বটেই, তার আগেও স্থানটির 'জোড়াসাঁকো' নাম খুব অপরিচিত ছিল না কলকাতার লোকের কাছে। ১৭৮০ সালের পর থেকে কলকাতার প্রাচীন পাট্টা-দলিলেও 'Jurah Sankoo' নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (Deed No 1165, dated 1st February 1786)। নামটি নতুন হলে পাট্টা-দলিলে এইভাবে ব্যবহৃত হত না। 'জোড়াবাগান' নামে খ্যাত শেঠদের বাগান আঠারো শতকের আগে, এমনকি ইংরেজরা কলকাতায় কুঠিস্থাপনের আগে থেকেই যে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার পরিষ্কার প্রমাণ আছে। ১৭০৭ সালে কৌন্সিলের সদস্যরা শেঠ-বাগানের খাজনা কমিয়ে দেন এই কারণে যে 'they being possessed

of the Ground which they made into Gardens before we had possession of the Towns.'[২৪] কাজেই সপ্তদশ শতকের শেষদিকে শেঠ-বসাকরা যখন সুতানুটিতে সুতার হাট বসিয়ে ঐ অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিলেন তার কিছু পর থেকে তাঁদের বাগানটিও গড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো নাম কলকাতা শহরে পরিচিত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। তা হলে 'জোড়াসাঁকো' নামটি পঞ্চানন ঠাকুরের আমলেই পরিচিত হবার কথা এবং তার আঞ্চলিক পরিচিতি হয়ত দর্পনারায়ণ-নীলমণি শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রতিষ্ঠার পর শহরময় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু জোড়াসাঁকোয় নতুন ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠার পরেও নীলমণি ঠাকুর ও তাঁর পুত্রদের আমলে এই শাখার ঠাকুরপরিবারের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যে কলকাতার সমাজে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা বলা কঠিন। বৈদেশিক দফ্‌তরে বিবিধ বিষয়ের নথিপত্রের মধ্যে **'Principal Hindoo Inhabitants of Calcutta'** নাম দিয়ে কতকগুলি পরিবারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে (১৮৩৯ সাল)।[২৫] তার মধ্যে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের পরিবার, রাজা সুখময় রায়ের পরিবার, মল্লিক পরিবার, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিবার, দেওয়ান রামচন্দ্র রায়ের পরিবার, খিদিরপুরের গোকুল ঘোষাল ও জয়নারায়ণ ঘোষালের পরিবার এবং আরও অনেক পরিবার ও ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ঠাকুর-পরিবার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা লক্ষণীয়, এখানে তা অবিকল উদ্ধৃত করছি

> **Thakoors. This is an extensive and very rich family— the principal branch of it is that derived from Durop Nerayun Thakoor who made his fortune as Dewan to Mr. Wheeler and in the Pay Office of that time. He had seven sons. Ram Mohun Thakoor (deceased), Gopee Mohun Thakoor, who died in 1816 after having long been at the head of the family to the great increase of its wealth— Krishna Mohun Thakoor (insane), Pearee Mohun Thakoor (born dumb and now dead), Huree Mohun Thakoor (living now in great respectability), Ladlee Mohun Thakoor Do and Mohunee Mohun**

> Thakoor who died a year or two ago leaving an infant child. Gopee Mohun left six sons, whereof the eldest Soorj Koomar Thakoor died childless shortly after. Chundur Koomar, Kalee Koomar, Nund Koomar, Hurro Koomar and Prosunno Koomar Thakoors now represent this branch.

ঠাকুরবংশের এই বিবরণের মধ্যে নীলমণি ঠাকুরের পরিবারের কোনো পরিচয় নেই। পরে 'List of the rich Bengalee Gentlemen of Calcutta' বলে অঞ্চলভেদে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ললিতমোহন ঠাকুর (?), শ্যামলাল ঠাকুর ও কানাইলাল ঠাকুরের নাম ছাড়া আর কোনো ঠাকুরের নাম নেই। মেছুয়াবাজার অঞ্চলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম সন্নিবেশিত হয়েছে

> Muchhoowa Bazar. Dowarakanath Thakoor, son of Rammunee Thakoor.

জোড়াসাঁকো অঞ্চলে দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের পৌত্রদের নাম, গৌরচরণ মল্লিকের পুত্র রূপলাল মল্লিক ও জমিদার শিবচরণ সান্ন্যালের পুত্র মধুসূদন সান্ন্যালের নাম আছে। নীলমণি-শাখার ঠাকুরপরিবারকে জোড়াসাঁকোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই শাখার শুধু দ্বারকানাথের নাম ছাড়া আর কোনো নাম নেই এবং দ্বারকানাথও মেছুয়াবাজার অঞ্চলভুক্ত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ১৮২৩ সালে দ্বারকানাথের গৃহপ্রবেশ উৎসবের যে খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয় তাতেও 'জোড়াসাঁকো' অঞ্চলের নাম নেই।

জোড়াসাঁকো সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ হল এই যে, নীলমণি শাখার ঠাকুরপরিবারের প্রসিদ্ধির সঙ্গে জোড়াসাঁকো যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। 'মেছুয়াবাজার' বা 'মেছোবাজার' নামের কোনো ধ্বনিমাধুর্য নেই, শোভাবাজার শ্যামবাজার বাগবাজার রাধাবাজার বৌবাজার বড়বাজার জানবাজার প্রভৃতি কলকাতার আরও অনেক বাজার-পদবীযুক্ত আঞ্চলিক নামের একটা যে সাধারণশ্রী আছে, মেছুয়াবাজার তা থেকেও বঞ্চিত। স্থান-মাহাত্ম্যের কতখানি যে নাম-মাহাত্ম্যের সঙ্গে জড়িত, ইতিহাসে সেটাও কম কৌতূহলের বিষয় নয়।

মেছুয়াবাজার তার নিরাভরণ শ্রীহীন পরিচয়ের জন্য ঠাকুরপরিবারের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। মেছুয়াবাজারের দ্বারকানাথ জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ হয়েছেন, পুরাতন মেছুয়াবাজারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল বহু-পুরাতন জোড়াসাঁকোর মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। দ্বারকানাথের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রবল টানে জোড়াসাঁকো নাম তার আঞ্চলিক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের আমলে দেশ থেকে দেশান্তরে পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও ঠাকুরপরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয় দ্বারকানাথ ঠাকুরকে।

দ্বারকানাথের জন্মের বছর তিন-চার আগে, ১৭৯০-৯১ সালে, নীলমণি ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর পৌত্র ও বংশের অন্যতম কীর্তিমান পুরুষকে দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র রামলোচন হন পরিবারের অভিভাবক। রামলোচনের পুত্রসন্তান ছিল না, তাই তিনি মধ্যম সহোদর রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ঘটনাটি নিয়ে পরে একটি কিংবদন্তীও রচিত হয়। একদিন এক সন্ন্যাসী রামলোচনের গৃহে ভিক্ষা করতে আসেন। রামলোচনের স্ত্রী ভিক্ষা নিয়ে এলে শিশু দ্বারকানাথকে খেলা করতে দেখে তিনি তাঁকে বলেন, 'মা—এই শিশুটি তোমার খুব সুলক্ষণযুক্ত; এ তোমাদের বংশের গৌরব হবে, ধনদৌলত মানসম্ভ্রম বাড়াবে, কৃতী ও যশস্বী পুরুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবে।' সন্ন্যাসীর কথা শুনে স্বামীর সম্মতিক্রমে ১৭৯৯ সালে রামলোচন-পত্নী দেবরপুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। বোঝা যায়, দ্বারকানাথের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরে কিংবদন্তীটি রচিত হয়েছে এবং তার নায়ক হয়েছেন যথারীতি একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী।

জ্যেষ্ঠতাত রামলোচনের স্বোপার্জিত সম্পত্তি ও পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দ্বারকানাথ পেয়েছিলেন সত্য, আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি মানুষ হননি। ঐশ্বর্যের মধ্যেই দ্বারকানাথ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। পথের ধুলো থেকে তাঁকে কিছু গড়ে তুলতে হয়নি। কিন্তু কেবল এই ঐশ্বর্যের জোরে দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' বলে পরিচিত হননি। ঠাকুরপরিবারের পঞ্চানন থেকে দর্পনারায়ণ-গোপীমোহন, নীলমণি-রামলোচনের ধারায় দ্বারকানাথ প্রথম নতুন পথ খুলে দেন। তাঁর বহুমুখী উদ্যম ও কর্মশক্তি সেই নতুন প্রবাহপথে বিচিত্র তরঙ্গের সৃষ্টি করে। পশ্চিম থেকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বহু জমিদারীর মালিক হন তিনি, তাঁর পৌত্র

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলীতে যে-সব জমিদারীর অপূর্ব প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে। এইসব জমিদারী অধিকারের ও তত্ত্বাবধানের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন সরকারী দলিলপত্রে টুকরো হয়ে রয়েছে। টুকরোগুলি জোড়া দিলে দ্বারকানাথের বিচিত্র কর্মপ্রতিভার একটা দিকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। অথচ একথাও ঠিক যে সেকেলে জমিদার বলতে সমাজের একটি অন্ধকার কোণ থেকে যে-ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দ্বারকানাথ সেই শ্রেণীর জমিদার ছিলেন না। প্রতাপের দিক থেকে নয়, চরিত্র ও প্রবৃত্তির দিক থেকে। প্রতাপ তাঁর হয়ত কোনো প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের চাইতে কম ছিল না, কিন্তু মন তাঁর 'বারো ভুঁইয়াদের' জমিদারীর যুগ অতিক্রম করে নিঃসন্দেহে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। মৃত স্বর্ণপিণ্ডের মতো অসাড় অচৈতন্য মূলধনকে (capital) তিনি মুক্ত বলাকার প্রাণাবেগে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, ভূসম্পত্তির গর্ভে নিশ্চিন্তে সমাধিস্থ করতে চাননি। কিন্তু পরাধীন দেশের ঔপনিবেশিক পরিবেশে তা সম্ভব হয়নি। তাই দ্বারকানাথের মূলধন ইংরেজদের অভিশাপেই শেষ পর্যন্ত আবার মাটিতেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবু তার বন্ধনমুক্তির ডানা-ঝাপ্‌টানি দেখলে হতবাক হয়ে যেতে হয়। নীলক্ষেত আর নীলকুঠি থেকে আরম্ভ করে চিনির কারখানা, কয়লার খনি, বাষ্পীয় পোত, ব্যাঙ্ক, এজেন্সি হাউস, সংবাদপত্র, নাট্যশালা, সর্বত্র দ্বারকানাথ সাহস করে তাঁর মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পঞ্চানন ঠাকুরের 'ক্যাপ্টেন পাকড়ানো', জয়রাম ঠাকুরের আমিনী, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিমক মহলের ও হাটবাজারের ইজারাদারী, নীলমণি ঠাকুরের সেরেস্তাদারী, গোপীমোহনের চীনা-বাজার, রামলোচন-রামমণির স্থির বিষয়বুদ্ধি, সব একত্র করলেও দ্বারকানাথের দুরন্ত উদ্যম ও অভিযানের কাছে তা হার মেনে যায়। দ্বারকানাথের জীবনটাকে মনে হয় একটা রূপকথার মতো। জীর্ণ দলিলপত্রের মধ্যে আজও তার অধিকাংশই চাপা পড়ে রয়েছে। যদি তা উদ্ধার করা যায় তাহলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিচিত্রগামী প্রতিভার আসল উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।[২৩]

জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথের গৃহপ্রবেশ-উৎসবে সেদিন ইংরেজ ও বাঙালীর মিলন-মিশ্রণে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের মিলন সূচিত হয়েছিল। কেবল জোড়াসাঁকোয় নয়, বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতেও এই মিলনের উৎসব হত ঘন ঘন, দ্বারকা-নাথের উদারতা ও ঐশ্বর্যের প্রকাশে দেশ-বিদেশের মানুষ বিস্মিত হত। মনে হয়

যেন দ্বারকানাথের নিজের জীবনটাও ছিল একজোড়া সাঁকোর মতো। একটি সাঁকো দিয়ে বাইরের বা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা আচার-প্রথা ভিতরে আসত, আর একটি সাঁকো দিয়ে স্বদেশের ভাবধারা ঐতিহ্য আচার-প্রথা বাইরে যেত। দুই সাঁকোর উপর দিয়েই গতি ছিল অবাধ। সহযোগী রামমোহনের মতো দ্বারকানাথও অস্তগামী মধ্যযুগ ও উদীয়মান নবযুগের সন্ধিক্ষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিশাল একটি সাঁকোর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে এই বিশ্ব ভারত-বাংলার সাংস্কৃতিক সাঁকোর বন্ধন আরও দৃঢ় করেছেন

১৩৬৯।১৯৬১

১ সম্পূর্ণ সংবাদটি এই: 'নূতনগৃহ সঞ্চার।—মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীন বাটীতে অনেক ২ ভাগ্যবান সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্য একজন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।' —সমাচার দর্পণ, ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, ১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা

২ ঈশানচন্দ্র বসু: শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মজুমদার লাইব্রেরী, ১৯০২ সন; ১২৮ পৃষ্ঠা

৩ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের 'পিরালী ব্রাহ্মণ' খণ্ড থেকে সংগৃহীত। এবিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসুর সমস্ত মতামত ও উক্তি এই বই থেকে গৃহীত হয়েছে।

৪ C R. Wilson: The Early Annals of the English in Bengal, Vol. 1

৫ Benoy Ghose: 'Some Old family-founders in 18th century Calcutta. The Setts of Sutanuti'—in *Bengal: Past and Present*, Vol. LXXIX, Part 1. January-June 1960

৬ Fort William General, dated 31 December 1706 (MS. Records)

৭ Letter to Court, January 10, 1758, para 110 —'We have been obliged to remove all the Natives out of Govindpore, where the new citadel will stand, the brick houses having been valued in the most equitable manner, and when reported to the Board, will be paid for; those who dwelt in thatched houses have had a consideration made them for the trouble and expense of removing, and have been allowed ground in other parts of the town and outskirts to settle in.'

৮ Proceedings, 1760 onwards, also Rev. Long's Selections from Unpublished Records, 1748-1767

৯ Consultations, September 18, 1758; Long: op. cit. p. 149

১০ Proceedings, July 31, 1760 ; Long : op. cit, p. 205

১১ Proceedings, January 29, 1766 ; Long : op. cit. p. 430

১২ Foreign Department Miscellaneous Records (MS), 1839, Vol. 131

১৩ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, July 1871, Nos. 52, 74 ; September 1781, No. 16

১৪ Ibid., February 1776, p. 262 ; February 15, 1776, p. 510-11 ; June 21, 1776, p. 1490-92

১৫ Calcutta Committee of Revenue, Proceedings, January 24, 1782 Nos. 3. 4. pp. 214–17

১৬ Ibid., December 1777, p. 246

১৭ Leases and Deeds, Vols. II and III No. 627, 26 and 27 August 1783 ; No. 709, 1784

১৮ James, W. Furrell : *The Tagore Family,—A memoir*, London, 1882, pp. 62-63

১৯ Calcutta Gazette, 1st November 1808

২০ Loke Nath Ghose : *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc.* Part II, Calcutta, 1881—'The Tagore Family', pp. 160-223

২১ Leases and Deeds, Vol. I, No. 144, 16 January 1781

২২ নগেন্দ্রনাথ বসুর পূর্বোক্ত গ্রন্থ

২৩ Wilson : Early Annals etc , Vol. I. pp. 158-9

২৪ Consultations, II September 1707

২৫ Fo-eign Department Miscellaneous Records, 1839. Vol. 131 (National Archives. New Delhi)

২৬ কিশোরীচাঁদ মিত্রের লেখা ইংরেজিতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে—*Memoir of Dwarakanath Tagore,* Calcutta 18.0. দ্বারকানাথের আসল কর্মজীবন ও কীর্তিকথার বিবরণ বিশেষ কিছু এই গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অপ্রকাশিত চিঠি থেকে মনে হয়, দ্বারকানাথের এই টুক্‌রো জীবনকথা কিশোরীচাঁদ লিখেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে। হাতের কাছে পারিবারিক সংগ্রহে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে যেসব কাগজপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন ছিল দেবেন্দ্রনাথ সেইগুলি কিশোরী-চাঁদকে দিয়েছিলেন এবং লেখার জন্য পারিশ্রমিক দিতেও সম্মত হয়েছিলেন। কিশোরী-চাঁদ নিজে এবিষয়ে তথ্যাদি অনুসন্ধান করেছিলেন বলে মনে হয় না। সেই কারণে তাঁর লেখা জীবনীটি কতকগুলি সংবাদপত্রের সমষ্টি হয়েছে মাত্র, দ্বারকানাথের প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত হয়নি।

লোকনাথ ঘোষের *'Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc.'* বইখানি (দুইখণ্ড) এবং Furrell-এর লেখা *'The Tagore Family'* কলকাতা ও লণ্ডন থেকে একই সময়ে (১৮৮১-৮২ সালে) প্রকাশিত হয়। ঘোষ ও ফারেল উভয়েই কিশোরীচাঁদ সম্বল করার ফলে ঠাকুরপরিবারের ইতিহাসে অনেক ফাঁক থেকে গেছে এবং ভুলভ্রান্তিও আছে। সংশোধন ও সুসম্পূর্ণ করার উপায় হল সরকারী নথিপত্র ও সমসাময়িক পত্রিকাদি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করা।

বিদ্যাসাগর-চিন্তা

ব্যক্তিচরিত্রের রূপায়ণে পরিবেশগত ও বংশগত প্রভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আজও তর্কের অবসান হয়নি। তর্ক না করেও উভয়েরই প্রভাব স্বীকার করে নিতে বাধা নেই। কিন্তু এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেও মনে রাখা দরকার যে মানুষ যন্ত্র নয়, পরিবেশ ও বংশগতির ঘাতপ্রতিঘাত কোনো মানুষকে হাতুড়ির মতো পিটিয়ে তৈরি করে না, কামারশালে লোহার যেমন তার হাতিয়ারকে করে। তা যদি হত তাহলে একই পরিবেশে, একই বংশে বিভিন্ন চরিত্রের ও গুণের মানুষ তৈরি হত না। ব্যক্তির সঙ্গে বংশগতির অথবা ব্যক্তির সঙ্গে বাইরের সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ক যান্ত্রিক বা **mechanical** নয়, দ্বান্দ্বিক বা **dialectical** ; ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় নয়, পরিবেশের ক্রীড়নক নয়। একই পরিবেশে, এরকম অনেক দেখা যায়, কেউ হয় সন্ন্যাসী, কেউ হয় ডাকাত, কেউ হয় চলিত ব্যবস্থার স্তাবক ও সেবক, কেউ হয় বিদ্রোহী ও বিপ্লবী। কেন এমন হয়? ব্যক্তি ও তার সমগ্র পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত-বিরোধের প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যের জন্য। সবই যদি জীন্-ক্রোমোসোম ও সামাজিক ঘটনাবর্তের যান্ত্রিক লীলা হত তাহলে সমাজে এতরকমের মানুষ ও এত বিচিত্র মানসতার বিকাশ দেখা যেত না। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে বাইরের সমাজের একটা **challenge-response**-এর সম্পর্ক থাকে, অর্থাৎ পদে পদে **contradiction** ও **confrontation**-এর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক স্থাপন করার মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির

পার্থক্য ঘটে—একেবারে নিছক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকেই, যাকে আমরা স্বাতন্ত্র্য বলি, কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে সংঘাতবিরোধের ভিতর দিয়ে বহুব্যক্তির মধ্যে সঙ্গতির ভিত্তিতে এক একটা বৃত্ত বা গোষ্ঠী গঠিত হয়। যেমন উনিশ শতকের ইতিহাসে আমাদের বাংলা দেশে হয়েছে। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পর্যন্ত অনেক চিন্তানায়ক ও সমাজনায়কের আবির্ভাব হয়েছে বাংলা দেশে, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যও দেখা গিয়েছে। এই ঘটনাবর্তের পরিবর্তনকে যদি আমরা সামাজিক ঋতু-পরিবর্তন মনে করি, তাহলে বলতে পারি যে বিভিন্ন সামাজিক ঋতুতে, পরিবেশের ঘাতপ্রতিঘাতজনিত মানসিক প্রাতক্রিয়া ও response-এর দিক থেকে, বিভিন্ন সামাজিক বৃত্ত রচিত হয়েছে, এবং পরিবেশ ক্রমে যত জটিল ও বিরোধমুখর হয়েছে, সামাজিক বৃত্তেরও তত বৈচিত্র্যসহ বিস্তার হয়েছে। যেমন উনিশ শতকের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে সংঘাতমুখী বিভিন্ন সামাজিক বৃত্তের বিস্তার ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি দেখা যায়। আবার এ-ও দেখা যায় যে নতুন কালানুবর্তী যে আদর্শসংঘাত, ideological battle, উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই প্রধানত তা ঘটেছে এবং সংঘাতকালে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীব মুখোমুখী শিবির-সন্নিবেশও হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে উনিশ শতকের এই দুই অর্ধাংশের ঠিক সন্ধিক্ষণে আমরা দেখতে পাই, যদিও আদর্শসংগ্রামে তাঁর শিবির-নির্বাচনের কাজ প্রথমার্ধেই শেষ হয়ে যায়।

১৮২০ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত মেদিনীপুরে বীরসিংহ গ্রামের গ্রামীণ পরিবেশে বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন কাটে। তারপর ১৮২৯ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত -২৯ বছরের মধ্যে—প্রায় ২২ বছর তাঁর শুধু কলকাতার গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে কেটে যায়, তার মধ্যে ১২ বছর কয়েকমাস ছাত্রজীবন, বাকি ১০ বছর সংস্কৃত কলেজের কর্মজীবন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভেই, সাত-আট বছরের মধ্যে—সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকালে, তাঁর সমাজকর্ম ও শিক্ষাকর্মের চূড়ান্ত বিকাশ হয়। তারপর উনিশ শতকের শেষ দশকের গোড়া পর্যন্ত (১৮৯১) তিনি বেঁচে থাকলেও, প্রায় ৩২-৩৩ বছর, এই দীর্ঘসময়টাকে আমরা তাঁর কর্মজীবনের অপরাহ্ণকাল বলে চিহ্নিত করতে পারি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল—চরিত্র ও ব্যক্তিত্বগঠনের

দিক থেকেও যা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কাল—সম্পূর্ণ কৈশোর ও যৌবন—কলকাতা শহরের এমন এক পরিবেশে এবং এমন একটি স্থানে কেটেছে—যা উনিশ শতকের বাংলার আদর্শসংঘাতের কেন্দ্রস্থল বলে গণ্য হতে পারে। ১৮৫০ সাল, অর্থাৎ তাঁর যখন ত্রিশ বছর বয়েস—তার মধ্যেই তিনি এই আদর্শসংগ্রামের ক্ষেত্রে তাঁর শিবির ও স্থানটি বেছে নিয়েছেন।

আদর্শ সংগ্রামের যে-শিবির বিদ্যাসাগর বেছে নিয়েছিলেন সেই শিবিরে প্রথম সারিতে সংগ্রামরত পুরুষ যাঁদের আমরা দেখতে পাই তাঁরা হলেন—রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন। এই আরও কয়েকজনের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগরের সমবয়সী এবং দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর উভয়েরই কর্মজীবনে অন্যতম সহকর্মী ও সহযোগী। রুগ্ন দেহের বোঝা সারাজীবন বহন করেও যে কি বিরাট বলিষ্ঠ মন ও চিন্তার অধিকারী হওয়া যায়, অক্ষয়কুমার তার একটি বিশেষ উল্লেখ্য নিদর্শন। এই ব্যক্তি সমাবেশের পাশাপাশি আমরা কয়েকটি সামাজিক বৃত্তের বা গোষ্ঠীরও সন্নিবেশ দেখতে পাই। এই বৃত্ত ও গোষ্ঠীগুলি হল: আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ং বেঙ্গল ও তত্ত্ববোধিনী সভা। এইসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিয়ে যে সামাজিক শিবির উনিশ শতকের প্রথমার্ধে গঠিত হয়, বিদ্যাসাগর সচেতনভাবে সেই শিবিরেই তাঁর স্থান বেছে নেন। এই শিবিরের আদর্শসংগ্রাম ও সমাজকর্মের উত্তরাধিকার তিনি বহন করেছেন এবং নিজের চরিত্রবলে ও বিচারবুদ্ধিতে তাঁর যে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হয়েছে প্রতিবেশের সংঘাতে, তাঁরই জন্য সেই সংগ্রামকে নতুন এক উন্নততর পর্যায়ে তিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এর বিপক্ষশিবিরে আমরা দেখতে পাই রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ দে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেক রাজা-মহারাজা ধনাঢ্য ব্যক্তিকে এবং বৃত্ত ও গোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাই ধর্মসভা, গৌড়ীয় সভা প্রভৃতি। সামাজিক শ্রেণীগতভাবে বিচার করলে উভয় পক্ষেই নতুন ধনাঢ্যদের সমাবেশ দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রথম শিবিরের তুলনায় দ্বিতীয় রক্ষণশীল শিবিরে সনাতনপন্থী ধনিকদের সংহতি অনেক বেশি দৃঢ়, মধ্যযুগীয় ফিউডাল মনোভাব ও সংস্কার তাঁদের মধ্যে অনেক বেশি প্রবল, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে তাঁরা অত্যধিক প্রাচীনপন্থী এবং নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত এলিটের সংখ্যা তাঁদের মধ্যে নিতান্তই নগণ্য। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র কালে নব্যশিক্ষিত এলিট-গোষ্ঠীর

বিকাশই হয়নি বলা চলে, কাজেই তাঁর সভায় প্রধানত নব্যজমিদারশ্রেণীর মধ্যে উদারপন্থী কয়েকজনকে দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী ইয়ংবেঙ্গল দল ও তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যাঁরা বাস্তবিকই সমাজজীবনে নতুন লক্ষ্য অভিমুখী গতি সঞ্চারিত করেছিলেন। এই নতুন লক্ষ্যমুখী গতিসঞ্চারকদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন ১৮২৯ সালের জুন মাসে। দু'মাসের মধ্যে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ ও সহমরণপ্রথা অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। হিন্দুসমাজের ধর্মাচারে সোজাসুজি হস্তক্ষেপ, কাজেই গোঁড়া হিন্দুসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য মাসখানেকের মধ্যেই 'ধর্মসভা' স্থাপিত হয় এবং বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ধর্মসভার অধ্যক্ষ মনোনীত হন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন হরনাথ তর্কভূষণ, নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, নাথুরাম শাস্ত্রী। এই পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন। এই পণ্ডিত অধ্যাপকদের মুখেই তিনি ধর্মসভার কর্মবৃত্তান্ত শুনতে শুনতে নিশ্চয় রামমোহনের কথা শুনেছেন, সতীদাহপ্রথা সম্বন্ধে শুনেছেন এবং তাঁর কিশোর মনে এদেশের শাস্ত্রীয় শাসন ও দেশাচার সম্বন্ধে ধীরে ধীরে একটা ধারণারও বিকাশ হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পরিবেশ অন্যদিক থেকেও তাঁর এই ধারণা সুস্পষ্ট করতে সহায় হয়েছে। সেই পরিবেশ রচনা করেছেন হিন্দুকলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ ১৮২৯-৩০ ৩১ সালের মধ্যে। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ ছিল একই প্রাঙ্গণে, এমনকি একই গৃহে বলা চলে। মধ্যে সংস্কৃত কলেজ, দুইপাশের দুটি সংলগ্ন একতলা গৃহে হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ও জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট, পরে যা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু স্কুলে পরিণত হয়। ডিরোজীয়ানরা এইসময় হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি কূপমণ্ডুকতা আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, এমনকি নব্য-প্রগতিবাদের মাদকতায় হিন্দুধর্মকেও লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রায় বদ্ধপরিকর হন। সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণ থেকেই এই প্রচণ্ড বিক্ষোভের তরঙ্গ ওঠে, ঠিক যখন বিদ্যাসাগর কৈশোরে পদার্পণ করছেন। রামমোহন অথবা তাঁর ব্রাহ্মসমাজ তাঁদের সুসংযত স্থিরবুদ্ধির জন্য যা করতে পারেননি, ইয়ংবেঙ্গল নতুন প্রগতিশীল পাশ্চাত্ত্য

জীবনদর্শন ও আদর্শের উন্মাদনায় তা করতে পেরেছিলেন। ধর্মসভার অত্যুগ্র গোঁড়ামি ও আস্ফালনের কাছে যখন ব্রাহ্মসমাজের সংযত উদারতা স্তিমিত মনে হচ্ছিল, তখন ইয়ংবেঙ্গলের অত্যুগ্র প্রগতিবাদ, অন্তত কিছুটা, ধর্মসভাকে যথাস্থানে আবদ্ধ করতে পেরেছিল। এই বিক্ষোভে আর একদিক থেকে ইন্ধন দেন ডাফ-হিল প্রমুখ খ্রীস্টান মিশনারীরা। নব্যশিক্ষিত তরুণদের হিন্দুসমাজ-ধর্মবিরোধী মনোভাবে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিতে থাকেন, উদ্দেশ্য এই সুযোগে তরুণদের ধর্মান্তরিত করা। ঠিক এইসময় রামমোহন রায় ইংলণ্ড চলে যান (১৮৩০, নভেম্বর), তার একবছরের মধ্যে ডিরোজিওর অকস্মাৎ মৃত্যু হয় (১৮৩, ডিসেম্বর) এবং রামমোহনের মৃত্যু হয় দু'বছরের মধ্যে, ব্রিস্টলে, ১৮৩৩, সেপ্টেম্বর সমাজ-সংগ্রামে যে শিবিরে বিদ্যাসাগরের স্থান, সেই শিবির প্রায় কাণ্ডারীহীন হয়ে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, যখন বিদ্যাসাগরের বয়স তের এবং তিনি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্র। কিশোর বিদ্যাসাগর স্বচক্ষে এই বিক্ষোভের দৃশ্য অনেক দেখেছেন এবং স্বকর্ণে এই আলোড়ন ও আদর্শগত বাদ-প্রতিবাদের ধ্বনিও শুনেছেন। তাঁর মন প্রস্তুত হবার মতো পরিবেশ পেয়েছে, বোধহয় উনিশ শতকের সবচেয়ে ঐতিহাসিক সংঘাতমুখর পরিবেশ। এই পরিবেশের মুখোমুখি মোকাবিলার জন্য দাঁড়াতে হলে কোন্ দিকে দাঁড়াতে হবে, সে সম্বন্ধেও কিছুটা ধারণা তাঁর হয়ত হয়েছে, কেবল দাঁড়াবার ভঙ্গিটি বা সংগ্রামের পন্থা-কৌশল ঠিক করার মতো বয়স তাঁর হয়নি।

দু'রকমের সামাজিক দৃশ্য দেখেছেন বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবনে। এক-রকমের দৃশ্য হল, হিন্দুসমাজের শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি ও দেশাচারের অন্ধ দাসত্ব এবং তার বিপরীত বিদেশী পাশ্চাত্ত্য আদর্শানুগত্যের একই রকমের উন্মাদনা। এটি হল আদর্শগত সংগ্রামের দৃশ্য। আর-একটি দৃশ্য হল, প্রাচীন ও নবীন জেনারেশনের সংগ্রাম। গোঁড়ামি ও দেশাচারপ্রীতি প্রধানত সমাজের বৃদ্ধ-প্রৌঢ়তন্ত্রের আদর্শ, এবং অবাধ অগ্রগতির অনুরাগ প্রধানত সমাজের তরুণতন্ত্রের আদর্শ, তরুণদের আদর্শপ্রীতির মধ্যে উচ্ছ্বাস আতিশয্য থাকা স্বাভাবিক এবং বৃদ্ধপ্রৌঢ়দের উৎকট গোঁড়ামিও অস্বাভাবিক নয়। তরুণ বয়সে তরুণদের আদর্শ-সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু তার কতটুকু উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য এবং কতটুকু গ্রহণযোগ্য নয়, তা বিচার করার মতো বয়স যখন

বিদ্যাসাগরের হয়েছে, তখন তিনি করেছেন। তাই বলে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেননি কোনদিন। তাঁর নিজের বুদ্ধিগ্রাহ্য আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি আপসপন্থী ছিলেন না, তা সে শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক আর সমাজের ক্ষেত্রেই হোক।

উনিশ শতকের তিরিশের গোড়াতে ডিরোজিও ও রামমোহনের মৃত্যুর ফলে ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ংবেঙ্গলের কার্যকলাপ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তাছাড়া ইয়ংবেঙ্গলের উৎসাহের প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাসও তখন অনেকটা স্থির হয়ে থিতিয়ে যায়। তিরিশের শেষদিক থেকে এই ধারার নতুন বাঁক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এইসময় আমরা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সমাজের এই শিবিরে প্রবেশ করতে দেখি, ১৮৩৯ সালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ২২ বছর, বিদ্যাসাগরের বয়স ১৯ এবং বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শ্রেণীর ছাত্র। পরিবার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মাত্র দশজনকে নিয়ে যে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হয়, সেই সভার সভ্যসংখ্যা তিন চার বছরের মধ্যে শতাধিক হয় এবং আরও কয়েক বছরের মধ্যে পঞ্চাশের দশকে প্রায় আটশ' পর্যন্ত হয়। অধিকাংশ সভ্যই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যভাগেই তত্ত্ববোধিনী সভা শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি-সভাতে পরিণত হয়। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকে বিচার করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তত্ত্ববোধিনী সভার মতো আর কোনো শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের বিদ্বৎসভাই হোক বা সমাজসভাই হোক, উনিশ শতকে এরকম ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। একথাও মনে রাখা দরকার যে দেবেন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন তখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেননি, যদিও সভা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তিনি সমস্ত শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার করা বলে ব্যক্ত করেছিলেন। ১৮৪২ সালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন, ১৮৪৩ সালে নিজে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন এবং ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনা ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তত্ত্ববোধিনী সভার উপর অর্পণ করেন। ১৮৪৩ সালেই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ঠিক এইসময় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে, ২২ বছর বয়সে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। দেবেন্দ্রনাথের বয়স ২৪/২৫, বিদ্যাসাগরের বয়স ২১/২২, দু'জনেই যুবক। তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করে দেবেন্দ্রনাথ

১৮২৯-৩০-এর প্রগতিশীল চিন্তাধারার মূল প্রবাহকে অব্যাহত রেখে তার বিদেশীভাবাপন্নতা, অসংযত উগ্রতাকে একটি সংযত সমন্বিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং খ্রীস্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্মবিদ্বেষী অপপ্রচার ও ধর্মান্তরের অভিযানকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন। সমাজসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কারকর্মে প্রগতিশীল পথেই তত্ত্বোধিনী সভার অভিযান আরম্ভ হয় এবং তার মুখপত্র হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। মনেহয় এ-যেন দেবেন্দ্রনাথ কতকটা অজ্ঞাতসারেই, ঠিক কর্মজীবনে প্রবেশের মুখে, বিদ্যাসাগরের সামাজিক জীবনের সচলতার জন্য, সংস্কৃত কলেজের বাইরে, একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা হল বিদ্যাসাগরের অন্যতম কর্মক্ষেত্র, সংস্কৃত কলেজের বাইরে। ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সভার যে সম্পর্ক ছিল, তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের সমর্থক ছিলেন, তার আচার-সংস্কার মেনে চলতেন এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর আদৌ নাস্তিক ছিলেন না, তিনি একেশ্বরবাদীই ছিলেন এবং তাঁর 'হরি'ই ছিলেন তাঁর কাছে ব্রহ্মস্বরূপ। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু, যিনি বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন, তিনি বিদ্যাসাগরের ধর্মমত সম্বন্ধে লিখেছেন : 'তার ধর্মজীবন সম্বন্ধে এই বলা যায় যে তাঁর ধর্মজীবন কর্মগত ছিল। কাজই তাঁর কাছে ধর্ম। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন, বোধোদয়ে আমরা তার নিদর্শন পাই। প্রতিমাপূজা তিনি লৌকিকভাবেই দেখতেন কেন না বাড়িতে তো কোনদিন পূজা হতে দেখিনি। তিনি বলতেন—যেটা পারবি সেইটে কর। লোকসেবাই তাঁর ধর্ম ছিল। এক সম্প্রদায়ের উপাসনা দেখে এসে তিনি বলেছিলেন তারা বলছে শুনলাম—আমরা মুশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি; ঈশারও পায়ের ধুলো নিচ্ছি; শ্রীচৈতন্যেরও পায়ের ধুলো নিচ্ছি; আরে বাপু ঈশা মুশা শ্রীচৈতন্য তো মরে ভূত হয়ে গেছে; পায়ের ধুলো কি রে বাবা! অনেকদিন কেটেছে এমন যে বিকেল থেকে ঠায় ঘরে বসে গল্পগুজব হতে হতে রাত হয়ে গেছে, সেইখানেই খাবার-টাবার এল, সকলের সঙ্গে তিনিও খেলেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে তো দেখিনি।' ধর্ম ও ধর্মাচরণের প্রতি এই যাঁর মনোভাব, যিনি প্রতিমাপূজা করতেন না, অবতারবাদে বিশ্বাস করতেন না, সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন না, তত্ত্ববোধিনী সভার ধর্মাদর্শের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না, একথা ভাববার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তার চেয়েও বড় কথা, তত্ত্ববোধিনী

সভার প্রধান লক্ষ্য যে ধর্মাদর্শ প্রচার তার প্রতি কোনো সহানুভূতি না থাকা সত্ত্বেও যে বিদ্যাসাগর ঐ সভা ও তার মুখপত্রের সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ ছাড়ার পরেও যে সেই সভার সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৯ সালে, এরকম আশ্চর্য কোনো ঘটনার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের কোনো সঙ্গতিই খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই একথা বিশ্বাস করতে বাধা নেই যে, তত্ত্ববোধিনী সভার ধর্মাদর্শ শিক্ষাদর্শ ও সামাজিক আদর্শের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর আদর্শ, মতামত ও বিশ্বাসের একটা বড় রকমের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বলেই কর্মজীবনের গোড়া থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর ও তাঁর অন্যতম সুহৃদ-সহযোগী অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই সভার উদার সহনশীল পরিবেশেই অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা ইত্যাদির প্রেরণা তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্রব থেকে তিনি অফুরন্ত পেয়েছেন এবং তা পেয়েছেন বলেই নির্ভয়ে তাঁর সংস্কারকর্মে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর সমাজসংস্কারকর্মের প্রধান প্রচারক ও সমর্থকের কাজ করেছেন এবং দেবেন্দ্রনাথ তাতে কোনদিন বাধা দেননি। মধ্যে মধ্যে তিনি কতকগুলি নাস্তিক বলে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন বটে, কিন্তু তাদের কাজকর্মে ও বিচারবিবেচনায় হস্তক্ষেপ করে রূঢ় কর্তৃত্ব প্রকাশ করেননি। তিনি উভয়েরই প্রতিভা, ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং সমাজের অগ্রগতির সংগ্রামে তাঁদের মতো যোদ্ধা ও একনিষ্ঠ কর্মী যে অত্যন্ত দুর্লভ তা-ও তিনি জানতেন। যে গরু দুধ দেয় তার চাট সহ্য করতে হয়, কতকটা এই ধরনের বোধ থেকে দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট ধৈর্য ধরে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন। এটা তাঁর অপরিসীম ঔদার্যের পরিচায়ক। বস্তুত তত্ত্ববোধিনী সভায় আজকাল আমরা যাকে **right-wing, left-wing** গোষ্ঠী বলি, এরকম গোষ্ঠী ছিল—বেশ বোঝা যায়। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তত্ত্ব-বোধিনী সভার **left-wing** গোষ্ঠীভুক্ত। যেখানে বিদ্যাসাগর সেইখানে অক্ষয়কুমার, যেখানে অক্ষয়কুমার সেইখানে বিদ্যাসাগর, একজন আর একজনের কীর্তি ও মতামত সমর্থনের জন্য উদগ্রীব, এরকম অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ জীবনের

কর্মক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না। এদিক দিয়ে, ব্যক্তিগতভাবে বিচার করলে, বিদ্যাসাগরের জীবনে অক্ষয়কুমারের দান অসামান্য বলা চলে।

আর একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে বিদ্যাসাগর ও তাঁর যুগের কথা শেষ করব। মনে হয়, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ও তাঁর জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমি অন্তত কিছুটা এর মধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যে ঘটনার কথা বলছিলাম, সেই ঘটনাটি এই। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, বিধবাবিবাহাদি সমাজসংস্কারকর্ম ও শিক্ষাসংস্কারকর্মের সর্বাধিক সক্রিয় পর্বও তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। ১৮৬৩-৬৪ সালের কথা। দেবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অক্ষয়কুমার অর্থাৎ অক্ষয়-গোষ্ঠী, একটি স্বতন্ত্র উপাসনা-সমাজ স্থাপন করেন। সেখানে নতুন পদ্ধতিতে উপাসনাও আরম্ভ হয়। এই নতুন উপাসনা-পদ্ধতি রচনায় বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসগ্রন্থে এই কথা উল্লেখ করে লিখেছেন—'they began to conduct divine service according to a new form framed by themselves and revised by Pandit Iswar Chandra Vidyasagar.' যদি তাই হয় তাহলে বিদ্যাসাগরের ধর্মমতের স্বরূপ সম্বন্ধে, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ও পরিবেশে তাঁর যৌবন কর্মজীবন ও তাঁর যাবতীয় সংস্কারকর্ম যে কতখানি পরিপুষ্ট সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না।*

*শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী কর্মিমণ্ডলীর উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের সার্ধজন্মশতবার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণ—২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭০

রবীন্দ্র-চিন্তা

রবীন্দ্রজীবনের অর্ধেক কেটেছে উনিশ শতকে, আর বাকি অর্ধেক বিশ শতকে। ঘটনাটা উনিশ-বিশের মতো সামান্য নয়, চিন্তা করলে এর অসামান্যতা ধরা পড়ে। রবীন্দ্রজীবনের দুই শতকের এই বিভাগটাকে আরও ভালো করে তলিয়ে দেখা উচিত।......

দুই অর্ধেকের পার্থক্য আছে। একটি শেষের অর্ধেক, আর একটি গোড়ার অর্ধেক। কারও শেষ ভালো, কারও গোড়া ভালো। যেমন উনিশ শতকের শেষ ভালো, বিশ শতকের গোড়া ভালো। বিশ শতকের শেষ হয়ত আরও অনেক ভালো, কিন্তু আপাতত তা আমাদের বুদ্ধির নাগালের বাইরে।......

উনিশ শতকের শেষ ভালো এইজন্য যে সেটা হল ভাঙা-গড়ার যুগ। ভাঙন ও গড়ন যে-যুগে পাশাপাশি চলতে থাকে তার প্রথম পর্বে সমাজ-মন্থনের ফলে অমৃত ও গরল দুয়েরই উত্থান হয়। কোন্‌টা অমৃত কোন্‌টা গরল ; এবং কেনই বা অমৃত আর কেনই বা গরল, তা স্থিরধীরভাবে বিবেচনা করে বুঝবার শক্তি সমাজের বেশির ভাগ লোকের থাকে না। বিচার-বিশ্লেষণ ও সমীকরণের কাজ আরম্ভ হয় পরে, যখন প্রথম চিন্তালোড়নের ফেনা-বুদ্‌বুদ্ মিলিয়ে যেতে থাকে। রামমোহন-ইয়ংবেঙ্গল-বিদ্যাসাগর এই প্রাথমিক আলোড়নের স্রষ্টা। বাংলার নিস্তরঙ্গ কূপমণ্ডুক সমাজে প্রচণ্ড আঘাত করে এঁরা যে তরঙ্গবিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন, তার ভিন্নমুখী স্রোতগুলির নির্দিষ্ট খাত বেছে নিয়ে প্রবাহিত হতে সময় লেগেছিল অনেক। নবযুগের

ভাববিপ্লবের সময় প্রথমে ভিন্নমুখী চিন্তাধারাগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে একটা জটিল আবর্ত রচনা করে। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেকে বাংলার মানসলোকে এইধরনের চিন্তাবর্ত রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অর্ধেকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, চিন্তার স্রোতগুলি স্পষ্টরূপ ধরে নির্দিষ্ট খাতে তখন বইতে আরম্ভ করেছিল। কোন্‌টা বলিষ্ঠ অগ্রপন্থী, কোন্‌টা বা দোদুল্যমান মধ্যপন্থী, কোন্‌টা পশ্চাদপন্থী— তা সাধারণ লোকের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে তখন কোনরকম গোঁজামিল দেওয়া সম্ভব ছিল না। সমাজে মধ্যে-মধ্যে এমন বিচিত্র সব ঘটনা-সমাবেশ হয় যে দুই পথে দুই পা দিয়ে চলতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের খুব একটা অসুবিধে হয় না। সে-রকম সুযোগ রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে বিশেষ ছিল না। সমাজের দেহে যেমন, সমাজের মনেও তেমনি শ্রেণীভেদ তখন প্রকট হয়ে উঠেছিল।......

প্রথমে চিন্তালোড়নটা বাংলা দেশে প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল বলে, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দেখা যায় যে সমাজচিন্তার সমস্ত ডালপালা যখন দেশের মাটিতে মূল গাড়তে চাইছে, তখন তার সমস্ত প্রাণশক্তির যোগান দিচ্ছে 'হিন্দুত্বের' ঐতিহাসিক চেতনা। নতুন স্বাদেশিকতাবোধের উন্মেষ হচ্ছে বটে, কিন্তু হিন্দুত্বের গাঢ় রঙে তা রঞ্জিত। দেশমাতৃকার ধ্যানমূর্তি গড়ছে তখন দেশের লোক, রবীন্দ্রনাথ সেই মায়ের কোলেই জন্মগ্রহণ করলেন, অথচ গাঢ় বা ফিকে কোনো রঙের ছোপ তাঁর মনে একটুও লাগল না। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতাবোধ কোনদিন সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শে কলুষিত হয়নি। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকরা জানেন, হিন্দুমেলার সামাজিক কলকোলাহল রবীন্দ্র-পরিবারেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ঠাকুর-পরিবারের যুবকরা এই নব্য-জাতীয়তার উদ্‌বোধনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। জাতীয় জাগরণের এই উষাকালে রবির উদয় মনেহয় গভীর তাৎপর্যে পূর্ণ।......

১৮৬০ সালে বাইশ বছরের যুবক কেশবচন্দ্র সেন তাঁর প্রথম রচনা 'Young Bengal, This is for you' প্রকাশ করেন। তৎকালের তরুণদের আহ্বান করে তিনি বলেন 'Rest assured, my friend, if in our country intellectual progress went hand in hand with religious development, if our educated countrymen had initited

themselves in living truths of religion, patriotism would not have been a matter of mere oration and essay, but a reality in practice.' নবযুগের শিক্ষার মধ্যে এই 'living truths of religion'-এর অভাবকেই কেশবচন্দ্র 'godless education'-এর ফল বলেছিলেন। তরুণ বাংলাকে নতুন জীবনমন্ত্রে জাগিয়ে তোলার জন্য কেশবচন্দ্রের এই বক্তৃতা, তাঁর ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা, আচার্যপদে অভিষেক, সঙ্গত সভা, ক্যালকাটা কলেজ, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রভৃতি স্থাপন (১৮৬০-৬২), সাহিত্যক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক ও মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের ঘটনা। তারপর রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম (১৮৬৩), আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভেদ (১৮৬৬), হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলার অধিবেশন আরম্ভ (১৮৬৭), বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ (১৮৭২), বেলঘরিয়ার তপোবনে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ (১৮৭৫)—এইসব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে থাকে। সমাজচিন্তার বিভিন্ন প্রবাহের যে নির্দিষ্ট খাতের কথা বলেছি, এই সময় থেকে সেগুলি স্পষ্টাকারে রেখায়িত হতে থাকে।......

'সঞ্জীবনী', 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকা মারফৎ রবীন্দ্রনাথ যে সামাজিক আদর্শ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন 'নবজীবন' 'প্রচার' 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে, আজও তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত রচনা করা হয়নি। উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদীদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় ও সামাজিক প্রগতির জন্য, মানবধর্মের অকৃত্রিম সত্যের জন্য যে লড়াই করেছিলেন, মনেহয় বাকি জীবনে সুসংহত বিপরীতচিন্তার সঙ্গে আর কখনও তাঁকে সেরকম লড়াই করতে হয়নি। চিন্তার এই সংঘাতের ইতিহাস যতদিন না লুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তার (social thoughts) অনুশীলন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 'হিং টিং ছট' কবিতা, 'গোরা' উপন্যাস প্রভৃতি রচনার প্রকৃত মানসিক পশ্চাদ্‌ভূমি অনুধাবন করাও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। যোগেন্দ্রচন্দ্র ও শশধর তর্কচূড়ামণিদের বক্তব্য কি ছিল তা না জানলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুশীলনে এটা একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে, ভরাট করা প্রয়োজন।

'গোরা' উপন্যাসটিকেও বিরাট একটি হিং টিং ছট্‌ কবিতা বলা যায়।

অন্তরালবর্তী ভাবগত সাদৃশ্যের দিক দিয়ে বলছি। চরিত্রায়ণের অপূর্ব দক্ষতায় প্রত্যেকটি চরিত্র মনে গভীর দাগ কেটে যায়, কাউকে চেষ্টা করেও ভোলা যায় না। তবু চরিত্রায়ণের চেয়ে জীবন ও জাতির আদর্শের রূপায়ণই গোরার বড় কথা। চরিত্রের চেয়ে বক্তব্য অনেক বড। কি সেই বক্তব্য? নায়ক গোরার জীবনের বিশাল সৌধ কেনই বা তিনি বৈদেশিক জনকত্বের বালুচরের উপর গড়ে তুললেন? কেনই বা সে রহস্যের আবরণ নায়কের কাছে উন্মোচন করলেন না পরিণতির আগে পর্যন্ত? এ কি হিন্দুধর্মের তর্কচূড়ামণিদের প্রতি নির্মম বিদ্রূপ? তামাসার তাসের প্রাসাদ রচনা? ব্রাহ্মধর্মের প্রতিও নির্মম কটাক্ষ আগাগোড়া 'গোরা'র মধ্যে করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের মিলনের ইঙ্গিতও যথেষ্ট রয়েছে 'গোরা'র মধ্যে। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম আদিগুরু রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন অত্যুগ্র ব্রাহ্মদের প্রকৃতিস্থ করার জন্য। 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথ কি তাই করেছেন? অথবা এই কথা বলতে চেয়েছেন যে সকল ধর্মের বাইরের মেকী খোলসটা পরিত্যাজ্য, বাকি আদত সত্তাটুকু সকলেরই সমান মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, এবং সেটা মানবধর্ম তথা বিশ্বমানবধর্ম? এরকম অনেক প্রশ্ন জাগে মনে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার ক্রমবিকাশের ধারাটিকে, সমস্ত ফাঁক ভরাট করে ধরতে না পারলে এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নয়। .....

প্রতিভার কাল-নিরপেক্ষতায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল হবে না কোনদিন, হবার প্রয়োজনও নেই। অনাদিকালের এই তর্ক অনন্তকাল ধরে চলবে, এবং তা চলে তো চলুক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চেতনার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আদৌ নড়বড়ে বলে মনে হয় না। তিনি নিজে তাই তাঁর প্রতিভার কালসাপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং কাব্যাকারে তার সুন্দর উত্তর দিয়ে গেছেন 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে' কবিতায়। আরও অনেক রচনায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ......

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রে তাঁর পিতা দ্বারকানাথের প্রভাব উল্লেখ্য বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব যতই প্রত্যক্ষ ও গভীর হোক না কেন, মনেহয় পিতার পুত্রের চেয়ে বিশ্বকবি তাঁর পিতামহের প্রকৃত পৌত্র ছিলেন অনেক বেশি। 'বিদ্যাসাগর-চরিতে' রবীন্দ্রনাথ নিজে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের চরিত্র সবিস্তারে বর্ণনা করে বলেছেন, 'এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো

সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকার-বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।' কেবল 'দরিদ্র' কথাটির বদলে 'অতুল ঐশ্বর্যশালী' কথাটি বসিয়ে বলা যায় যে প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁর নবমপৌত্রের অংশে রেখে গিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনী ও আত্মজীবনী দুই-ই আছে, কিন্তু কিশোরীচাঁদ মিত্রের একখানি অসম্পূর্ণ ইংরেজি জীবনী ছাড়া দ্বারকানাথের কিছু নেই। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের ধ্যানগম্ভীর আত্মমুখী প্রশান্তি রবীন্দ্রচরিত্রে বর্তেছিল বটে, কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য যে বলাকার উদ্দাম সচলতা, যে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'র আবেগ, যে দুর্বার দুরন্ত অভিযানের অনির্বাণ বাসনা, তা একান্তভাবে দ্বারকানাথের 'material'-ঐশ্বর্যমুখী চরিত্রের 'ideological' বা 'intellectual'-ঐশ্বর্যমুখী রূপান্তর। 'Money' এবং 'Talent', 'Wealth' এবং 'Erudition'—এই দুটিই হল শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের প্রধান মানদণ্ড। প্রথমটি (Money বা Wealth) দ্বারকানাথ অর্জন করেছিলেন, দ্বিতীয়টি অর্জন করেছিলেন তাঁর পৌত্র রবীন্দ্রনাথ। দু'য়েরই 'common factor is motive energy and a powerful dynamic'—যা পিতামহ ও পৌত্র উভয়েরই প্রচুর পরিমাণে ছিল। নবযুগের 'economic entrepreneur' দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদর্শ 'intellectual entrepreneur'—এবং দ্বারকানাথ ও রবীন্দ্রনাথের মিলনেই রেনেসাঁসের অখণ্ড চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ······

তাঁর জীবনের 'hero' কে? এ-প্রশ্ন একবার রবীন্দ্রনাথকে করা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'রামমোহন রায়'। এই প্রশ্ন বা উত্তর কোনটাই আমরা আজও ভাল করে বিচার করিনি। ঠাকুর-পরিবারের (রবীন্দ্র-শাখার) আদর্শের মূল যে রামমোহনের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার মধ্যে কত গভীরভাবে নিহিত ছিল তা দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথের জীবন থেকেই বোঝা যায়। দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর মানসপুত্র। রামমোহনের আদর্শই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যকর্মে ও চিন্তাধারায় পরিব্যাপ্ত। ভারত-পথিক রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে।

সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়, বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙ্গে বেরল, চারিদিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হোলো। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয় যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ। এই বেড়াভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ-সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল।' রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা সম্বন্ধেও তাঁর নিজের এই উক্তি প্রযোজ্য।......

অগাধ জলধিতুল্য রবীন্দ্রসাহিত্যের সম্যক পর্যালোচনা করতে হলে তার কালানুক্রমিক পর্বভেদ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যহেতু পর্বভেদে মতভেদ দেখা দিতে পারে। তা দিলেও উপায় নেই, এই পথেই অগ্রসর হতে হবে। দেহের বা বয়সের বিকাশের সঙ্গে যেমন মনের বিকাশ হয়, তেমনি দেশকালের বা সমাজের বিকাশের সঙ্গে ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ হয়। সমান্তরাল পথে সরলগতিতে নয়, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে। ১৮৭৫ সালে 'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতা প্রকাশ থেকে ১৯৪১ সালের 'শেষ লেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্রসাহিত্যের রচনাকালের একটা চলনসই ভেদ-পর্ব এইভাবে করা যেতে পারে :

প্রথম পর্ব : ১৮৭৫—১৮৯৯। বয়স ১৪ থেকে ৩৯ বছর, প্রায় সম্পূর্ণ যৌবনকালটা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গভীর জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতা-বোধ, বাংলাভাষা, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির প্রতি নিবিড় অনুরাগ এইসময় পাকা বনেদের উপর গড়ে ওঠে। কবি কাহিনী, বাল্মীকি প্রতিভা, সন্ধ্যা সঙ্গীত, বৌঠাকুরাণীর হাট, প্রভাত সঙ্গীত, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, সোনার তরী, চিত্রা, বৈকুণ্ঠের খাতা, পঞ্চভূত, কণিকা পর্যন্ত সাহিত্যকর্মের অগ্রগতি। বাংলার লোকসংস্কৃতির পুনরনুশীলনে প্রায় একুশ-বাইশ বছর বয়স থেকে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। সমাজচিন্তার অগ্রসরগতি যাতে অবরুদ্ধ না হয় তার জন্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে এইসময় তাঁকে কঠোর আদর্শসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়।

দ্বিতীয় পর্ব : ১৯০০—১৯১৫। বয়স প্রায় ৪০ থেকে ৫৫ বছর। ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, চোখের বালি, আত্মশক্তি, বাউল, স্বদেশ, ভারতবর্ষ, খেয়া, নৌকাডুবি, প্রাচীন সাহিত্য, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, রাজা প্রজা, সমূহ, সমাজ, শারদোৎসব, শিক্ষা, ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, গোরা, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, চৈতালি, ছিন্নপত্র, অচলায়তন, গীতালি পর্যন্ত এই পর্বের সাহিত্যযাত্রা। স্বদেশী-যুগের মন বহু রচনার মধ্যে সক্রিয়। চিন্তার পরিণতি, অগ্রগতি এবং দূর থেকে দূরান্তের অভিযানের উৎকণ্ঠাও লক্ষণীয়।

তৃতীয় পর্ব : ১৯১৬—১৯৩০। বয়স প্রায় ৫৬ থেকে ৭০ বছর। ফাল্গুনী, ঘরে বাইরে, বলাকা, চতুরঙ্গ থেকে লিপিকা, পূরবী, সংকলন, রক্তকরবী, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, মহুয়া পর্যন্ত সাহিত্যের অগ্রগতি। দেহের যৌবন উত্তীর্ণ হলেও মনের যৌবন কাণায়-কাণায় ভরা। যৌবনোত্তরকালে রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। সমাজচেতনার প্রাখর্য কমেনি, বরং বেড়েছে এবং তার সঙ্গে জীবন-আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়েছে।

চতুর্থ পর্ব : ১৯৩১—১৯৩৯। বয়স সত্তরের কোঠায় চলেছে। 'রাশিয়ার চিঠি' থেকে আরম্ভ করে পুনশ্চ, দুই বোন, মানুষের ধর্ম, মালঞ্চ, শ্যামলী, কালান্তর, প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশ-প্রদীপ পর্যন্ত সাহিত্যযাত্রা। নতুন পৃথিবী, নতুন সমাজ, নতুন মানুষ ও নতুন জীবনকে বুঝবার আবেগপূর্ণ আকুতি রবীন্দ্রনাথের সত্তরের সাহিত্যে পরিস্ফুট।

পঞ্চম পর্ব : ১৯৪০—১৯৪১। বয়স আশীর কোঠায় পড়ল। জীবনেরও শেষ হল। তবু এও একটা স্বাতন্ত্র্যউজ্জ্বল পর্ব। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধ এর পটভূমি। দেবাসুর সংগ্রামে মানবসভ্যতার চূড়ান্ত সংকট। 'নবজাতক' থেকে শুরু করে সানাই, তিন সঙ্গী, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, সভ্যতার সংকট, শেষ লেখা পর্যন্ত সাহিত্যের যাত্রাশেষ। নতুন জীবনের অঙ্গীকারে আস্থা আশীতে আরও আবেগমুখী হচ্ছিল মনে হয়। কালক্রমে রবীন্দ্রমানসের এই বিচিত্র অভিব্যক্তি অত্যাশ্চর্য নয় কি ?……

কালানুক্রমিক আলোচনায় লাভ এই যে রবীন্দ্রমানসের আঁকাবাঁকা উর্ধ্বগতির পথরেখাটি তাতে ধরা পড়তে পারে। পূর্বোক্ত পর্বভেদ থেকে এইটাই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের বয়স যত প্রবীণ হয়েছে, তাঁর মন তত নবীন হয়েছে, কিন্তু তাঁর সেই মন কখনও দেশকালের চেতনাভূমি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়নি।

অতএব দেশকালের পরিবর্তনশীল আবেষ্টনের সঙ্গে, এবং সমাজচিন্তার সংঘাতমুখর অগ্রসরগতির সঙ্গে যোগ রেখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কীর্তির অনুশীলন করলে তার বিশালতা ও বিশিষ্টতা দুই-ই উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পাবে।

১৯৬১

[লেখকের নোটবই থেকে টুকরো চিন্তাগুলি সংকলিত।

বিবেকানন্দ-চিন্তা

সমগ্র উনবিংশ শতক ধরে বাংলা দেশে নানারকমের ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাত চলছিল। মোটামুটি পর্বভাগ করলে বিগত শতকের এই আন্দোলনের ধারাকে চারভাগে ভাগ করা যায়:

১. রামমোহনের যুগ
২. ইয়ংবেঙ্গলের যুগ
৩. বিদ্যাসাগর ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যুগ
৪. রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগ

পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে এক-একটা পর্বকে ভাগ করলে এইসব আন্দোলনের ঐতিহাসিক কালক্রমেরও বিশেষ অদল-বদল করার দরকার করে না। সংস্কার আন্দোলনের এই পর্বান্তরের ধারা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবন চতুর্থ বা শেষপর্বে পরিব্যাপ্ত।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই চতুর্থ পর্বটির বিশেষ গুরুত্ব আছে একাধিক কারণে। প্রথম কারণ হল, উনিশ শতকের প্রথম থেকে আন্দোলনের এই ধারাগুলিকে যদি নদীর ধারার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে মনেহয় যেন চতুর্থ পর্বে সেগুলি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে এসে একত্রে মিলিত হয়েছে এবং প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি করেছে। কেবল বাইরের সমাজে যে আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে তা নয়, ব্যক্তিমানসেও আবর্ত রচিত হয়েছে এবং তার ফলে দ্বন্দ্ব ও সংশয়

জেগেছে সমাজের সকলশ্রেণীর মানুষের মনে। দ্বিতীয় কারণ ধর্ম বা সমাজ-সংস্কারের কোনো আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন তার ফলাফল বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ঠিক বোঝা যায় না। যে-কোনো দেশের জনসমাজের স্তর বহুদুব পযন্ত বিস্তৃত, আমাদের দেশের তো বটেই। ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে জনসমাজকে কতকটা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মনেহয় যেন অতলস্পর্শ। মানুষের চিন্তা ও মনোভাবের কোনো থৈ খুঁজে পাওয়া যায় না। ১৯৬২ সালেও এদেশের সংবাদপত্রে 'সতীদাহে'র খবর প্রকাশিত হয়েছে, অথচ ১৮২৯ সালে রামমোহন রায় ও অন্যান্য সংস্কারপন্থীদের আন্দোলনের ফলে বেন্টিঙ্ক আইন পাস করে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করেছিলেন। আজও ভারতবর্ষে একহাজার বিবাহযোগ্য বিধবার মধ্যে একজনেরও পুনর্বিবাহ হয় কি না সন্দেহ, অথচ বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর তা আজকে অন্তত স্বাভাবিকভাবে হতে কোনো বাধা নেই। পৌত্তলিকতা বর্জন করে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তনের জন্য রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মধর্মপন্থীরা যথেষ্ট আন্দোলন করেছিলেন। তাঁরা যখন আন্দোলন করেছিলেন তখন এই ব্রহ্মোপাসনার তাৎপর্য বোঝার মতো উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও খুব অল্প ছিল। সুতরাং তখন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সমাজে গৃহীত না হওয়ার কারণ বোঝা যায় কিন্তু শতাধিক বছর পরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যখন শতগুণ বেড়েছে এবং বিজ্ঞান ও অন্যান্য দিকে মানুষের যখন আশ্চয উন্নতি হয়েছে, তখন এদেশে পৌত্তলিকতা আবার কেন শতগুণ বেগে ফিরে আসছে? কেবল ফিরে আসছে না, তার আধিপত্যও মনেহয় আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন?

উনিশ শতকের এইসব সংস্কারের কথা ছেড়ে দিয়ে যদি আরও অনেক পশ্চাতে ফিরে চাওয়া যায় তাহলে বর্তমান সমাজের দৃশ্য অনুরূপ কারণে আরও বেশি ভয়াবহ মনে হবে। তুকৃতাক্ ঝাড়ফুঁক ভূত-প্রেত-ওঝা-তাবিজ-কবচ-মাদুলি —এসব প্রাগৈতিহাসিক বর্বর যুগের কথা, অথচ আধুনিক সমাজে এগুলিরও আধিপত্য যে কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত তা খোঁজ করলে রীতিমত অবাক হয়ে যেতে হয়। কত শত আন্দোলন, কত শিক্ষা, কত প্রগতিশীল ভাবধারা এগুলির অলীকতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেও যে ব্যর্থ হয়েছে তা কল্পনা করা যায় না। আমাদের সমাজে বিশেষ করে, ঠিক পৌত্তলিকতার মতো এইসব

আদিম লোকাচারের পুনরাধিপত্যের প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। এরই বা কারণ কি ? এরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, কিন্তু আমাদের মূল প্রতিপাদ্যের জন্য এইটুকুই যথেষ্ট।

আমাদের প্রতিপাদ্য ছিল—বাংলা দেশে উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলাফল। এই ফলাফল না জানলে, স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। উনিশ শতকী সংস্কার আন্দোলনের ঢেউ সমাজের সর্বজনস্তরে পৌঁছয়নি। সবস্তর তো দূরের কথা, উপরের স্তরেও ব্যক্তিমানসের গভীরে বেশিদূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছিল কি-না সন্দেহ। জনসীমা তো দূরের কথা, এইসব আন্দোলনের ভৌগোলিক সীমাও আদৌ বিস্তৃত ছিল না। কলকাতা শহর, শহরতলী অঞ্চল এবং বর্ধমান কৃষ্ণনগর ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় মফঃস্বল শহরই ছিল আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রকৃত জনশিক্ষার প্রসার বিশেষ কিছু হয়নি বললেও ভুল হয় না। অতএব সমাজের গভীরে তো বটেই, উপরের দিকেও মানুষের মনে সংস্কার-আন্দোলন প্রত্যাশিত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। মানুষের মানসিক পরিবর্তন, চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহারের পরিবর্তন ধর্মবিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির পরিবর্তন যে কত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং বাইরের পরিবর্তনের অন্তরালেও যে কত স্থিতিশীলতার চোরাবালিস্তর লুকিয়ে থাকে, তা আগেকার দৃষ্টান্তগুলি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। উনিশ শতকের গোড়ার ৩০।৪০ বছরের আন্দোলন শেষ পর্বের দিকে যখন থিতিয়ে এল, তখন দেখা গেল তার ফলাফল আশাপ্রদ তো হয়ইনি, বরং উন্নতিকামী সংস্কার-পন্থীদের একদেশদর্শিতা এবং অনেকক্ষেত্রে অবিমৃষ্যকারিতার ফলে জনচিত্তে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। বাংলার সমাজ-জীবনে এক নতুন সংকটের কালো মেঘ জমা হচ্ছে। উনিশ শতকের তিরিশে যেমন উন্নতিকামীরা পাশ্চাত্য-ভাবোন্মত্ত হয়ে প্রগতির পথে অনেকটা উন্মার্গ হয়েছিলেন, শেষপর্বেও তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার অত্যুৎসাহে রক্ষণশীলেরা অত্যধিক কূপমণ্ডুকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পশ্চিম থেকে পূবে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে সমস্ত চিন্তাস্রোতকে শশধর তর্কচূড়ামণিরা একেবারে ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেনও। এমন সময় এই সংকটকালে রামকৃষ্ণ পরমহংস ধর্মসমন্বয়ের নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন এবং সেই আদর্শ প্রচারে সর্বশক্তি প্রয়োগের সঙ্কল্প নিয়ে

সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বামী বিবেকানন্দ। উন্মার্গ প্রগতিশীল এবং নিষ্ফল আক্রোশে অন্ধ সংরক্ষণশীল উভয় দলের আতিশয্যের কঠোর সমালোচনা করে বিবেকানন্দ সকলের সামনে এক নতুন আদর্শ তুলে ধরলেন। দেশের চিন্তাসংকটের এই সন্ধিক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব। সমগ্র উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের পশ্চাদ্ভূমিতেই কেবল এই চিন্তাসংকটের স্বরূপ এবং বিবেকানন্দের আবিভাবের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব।

তখন কেশবচন্দ্রের যুগ। বিবেকানন্দের জন্মের বছর দুই আগে থেকে (১৮৬১) কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন, 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলার তরুণসমাজের উপর কেশবচন্দ্রের অপরিসীম প্রভাব, তাঁর বাগ্মিতা, যুক্তিবাদিতা, তেজস্বিতা ও প্রতিভার দীপ্তিতে সকলে মুগ্ধ। সমাজে তখন চারিদিক থেকে নাস্তিকতা, বিশৃঙ্খলা, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। একটা নৈরাশ্যের দীর্ঘছায়া শিক্ষিত বাঙালীর মনে সঞ্চারিত হচ্ছে এবং অন্ধ আক্রোশে তা বাইরে বিস্ফোরিত হতে চাচ্ছে। এই ঐতিহাসিক সুবর্ণক্ষণে গোঁড়া হিন্দু সনাতন-বাদীরা নিজেদের পুরাতন তূণীর থেকে শাস্ত্রীয় শস্ত্র উদ্যত করে প্রগতিশীল শিবিরে প্রচণ্ড প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং আক্রমণ আরম্ভও করেছিলেন। এইসময় বিবেকানন্দের পক্ষে কেশবচন্দ্রের প্রতি এবং তাঁর ভিতর দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক এবং তিনি তাই হয়েছিলেনও। তরুণদের নিয়ে কেশবচন্দ্র 'ব্যাণ্ড অফ হোপ' নামে (Band of hope) একটি দল গঠন করেছিলেন এবং বিবেকানন্দ এই দলে নাম লিখিয়েছিলেন। নাম লেখানো তাঁর সার্থক হয়েছিল, কারণ এই আশাবাদীদের দলের ভিতর ধীরে ধীরে পরবর্তী জীবনে বিবেকানন্দ নতুন আশার প্রভাতসূর্যের মতো বাংলার সমাজ-গগনে উদিত হয়েছিলেন।

যদি ব্রাহ্ম আন্দোলনের সংহতিতে সেই সময় ফাটল না ধরত, রাজনারায়ণ বসুর মতো প্রবীণ ব্রাহ্ম নেতারা 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদনে উদ্‌যোগী না হতেন, ব্রাহ্মধর্মের ভিতরে হিন্দুধর্মের ও খ্রীস্টধর্মের জোয়ার ভিন্নমুখী খাতে বইতে আরম্ভ না করত, কেশবচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী নেতারা পরস্পর-বিরোধী ভাবাবর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে নোঙরহীন নৌকার মতো দিগ্‌ভ্রান্ত না হতেন, এবং

সবার উপরে যদি সমাজের শিক্ষিত উন্নতিশীল সংস্কারপন্থীরা অতিরিক্ত বিদেশী আদর্শপন্থী, স্বদেশী ঐতিহ্যবিচ্ছিন্ন নিরবলম্ব পরগাছাশ্রেণীতে পরিণত না হতেন, তাহলে বিবেকানন্দের মানসিক বিকাশ কোন্ পথে পরিচালিত হত এবং সমাজে কোন্ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হতেন তা বলা যায় না। মনেহয় তিনি এদেশের প্রথম প্রকৃত বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রনায়ক হতেন। অবশ্য এতগুলি 'যদি'র মুখাপেক্ষী হয়ে বিবেকানন্দের কল্পিত মূর্তি ধ্যান করে কোনো লাভ নেই। সমাজ জীবনের বাস্তবধারায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার যে বিকাশ হয়েছে, তাই আমাদের অনুধাবন করা কর্তব্য।

উনিশ শতকের সংস্কার-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ বহু উক্তি করেছেন। তাঁর নিজের সংস্কারকর্মের তাৎপর্য ও প্রেরণার উৎস কোথায় জানতে হলে তাঁর এই বক্তব্যগুলি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে। একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: 'প্রায় শতবর্ষ ধরে আমাদের দেশে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন হয়েছে তার ফলে সমাজের কোনো স্থায়ী মঙ্গল হয়নি কেন? মঞ্চ থেকে হাজার হাজার বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা-বিশারদরা হিন্দুসভ্যতার মাথায় অজস্রধারায় নিন্দাবাদ ও অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন, কিন্তু কোনকিছুতেই সমাজের কোনো উপকার হয়নি। কেন হয়নি? এই নিন্দা, গালাগালি ও অভিসম্পাতের জন্য। তাছাড়া অধিকাংশ শিক্ষিত সংস্কারপন্থী পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার নির্বিচার অনুকরণের পক্ষপাতী এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। অন্যান্য বিদেশী জাতির কাছ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় যে কিছু নেই, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তাই বলে স্বদেশের সবস্ব খুইয়ে বিদেশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, এ-ও এক সৃষ্টিছাড়া ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হাজার 'উন্নতি' 'উন্নতি' বলে চীৎকার করলেও দেশে একতিলও উন্নতি হয় না, হতে পারে না। স্বদেশের সমাজ ও জনসাধারণকে কটূক্তি করে আর গালাগালি দিয়ে কখনও কোনো হিতসাধন করা যায় না।'

আর-একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: 'ভারতবর্ষের নানাস্থানে গত দশ বছর ধরে ভ্রমণ করে দেখেছি, সমাজসংস্কার সভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাদের রক্ত শোষণ করে 'ভদ্রলোক' নামে ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হয়েছেন এবং ভদ্রলোকত্ব বজায় রেখে চলেছেন, তাদের জন্য কোথাও একটি সভাও দেখলাম না।' এই

প্রসঙ্গেই আরএকটি বক্তৃতায় তিনি বলেন : 'আমরা সংস্কারের কথা, উন্নতির কথা বলছি বটে, কিন্তু যাদের জন্য সংস্কার, যাদের জন্য উন্নতি, তারা কোথায়? মুষ্টিমেয় একদল লোক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছেন, বড় বড় কথা বলছেন, কিন্তু সমগ্র জাতি নড়েচড়ে না কেন? বর্তমান যুগ রাজশক্তির যুগ নয়, জনশক্তির যুগ। কিন্তু কোথায় সেই জনশক্তি—তাকে সংগঠিত ও উদ্‌বুদ্ধ করার চেষ্টা কোথায়? প্রকৃত স্বদেশপ্রীতির ও স্বজনপ্রীতির অভাবে এতদিন আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকরা এই চেষ্টা করেননি, এবং তা করেননি বলেই উনিশ শতকের সমস্ত সংস্কার আন্দোলন একটা উপরের পোশাকী আন্দোলন হয়েছে, সাধারণ জনচিত্তকে স্পর্শ করতে পারেনি।'

এই ধরনের বহু বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও রচনার ভিতর দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা প্রকাশ পেয়েছে। মনেহয় তিনি নিজেই যেন তাঁর সামাজিক-ঐতিহাসিক ভূমিকার পশ্চাদ্‌ভূমি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কিন্তু এর পরেও একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়—প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-সংস্কারের পথে না অগ্রসর হয়ে, বিবেকানন্দ ধর্মসংস্কার ও ধর্মপ্রচারের পথে কেন অগ্রসর হয়েছিলেন? এর বিস্তারিত উত্তর স্বভাবতই দীর্ঘ হবে। সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর এই হতে পারে :

প্রথম কারণ—'ধর্ম' হল যা ধারণ করে। ধর্ম মানে জপতপমন্ত্র আচার-অনুষ্ঠান নয়। কতকগুলি প্রত্যয়, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা, ন্যায়-অন্যায় ও নীতিবোধ ইত্যাদি যা মূলত কোনো জাতির সত্তাকে যুগ যুগ ধরে ধারণ করে থাকে, সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই জাতির প্রাণস্পন্দন রক্ষা করে চলে, সেইটাই হল সেই জাতির ধর্ম। বিবেকানন্দের ধর্মমত ও ধর্মসংস্কারের আসল তাৎপর্য বুঝতে হলে ধর্মকে এই অর্থে গ্রহণ ও বিচার করতে হবে। তা করলে সহজেই বোঝা যাবে বিবেকানন্দ কেন ধর্মের পথে, এবং প্রধানত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব ব্যাখ্যা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সমগ্র জাতির মানস-সত্তার মূলভিত্তিটিকে তিনি সবার আগে সুদৃঢ় করে গড়তে চেয়েছিলেন। দেশের যে অবস্থা তখন, তাতে আগে এইভাবে হালচষে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত না হলে বীজ কোথায় ছড়ানো হবে? এবং ছড়ানো হলেই বা তাতে ফসল ফলবে কেন?

দ্বিতীয় কারণ হল—হিন্দুধর্মই তখন সব দিক থেকে বিপন্ন হয়ে উঠেছিল।

দেশী ও বিদেশী খ্রীস্টান পাদ্রীরা যত্রতত্র হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের কুৎসা রটনা করে খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। নব্যশিক্ষিত বাঙালীদের একটা বড অংশ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটূক্তি করাকেই তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। যে যত হিন্দুবিরোধী সে তত প্রগতিশীল—এইরকম একটা মনোভাব শিক্ষিতদের মধ্যে তখন বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। একটা গোলামসুলভ সাহেবিয়ানা ছিল প্রগতির বড লক্ষণ। সুতরাং ভারতের বৃহত্তর হিন্দুসমাজের কল্যাণের জন্য কিছু করতে হলে সবাগ্রে হিন্দুধর্মকে অপবাদ ও কুসংস্কারের পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। বিবেকানন্দ এই ঐতিহাসিক প্রয়োজন উপলব্ধি করেই হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন।

তৃতীয় কারণ হল—এই কাজ তখনকার শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যাঁরা করতে পারতেন – ব্রাহ্মধর্মপন্থীরা—তাঁরা নিজেদের কর্মপ্রণালীর দোষে সাধারণ হিন্দু-সমাজের কাছে বিশ্বাসভাজন ছিলেন না। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল—রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্রাহ্মধর্মের প্রবীণ নেতারা অনেকেই তখন ব্রাহ্মধর্মের স্বার্থেই 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদনে অগ্রণী হয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন যদিও এর ব্যতিক্রম ছিলেন, তাহলেও তাঁর খ্রীস্টভক্তির আতিশয্য ও অবতারবাদের মোহ সুস্থ-সবল ধর্মসংস্কারের ধারাকে যে অনেকখানি পঙ্কিল ও দুর্বল করে দিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া ব্রাহ্মধর্মপন্থীদের সংস্কার-প্রচেষ্টা প্রধানত সমাজে উচ্চবিত্ত ও উচ্চশিক্ষিত স্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের আবেদন-নিবেদন কোনদিন সাধারণ জনস্তর পর্যন্ত পৌঁছয়নি, এবং তাঁদের ঔপনিষদিক জটিল তত্ত্বপ্রধান ধর্মব্যাখ্যা সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য ও অনাকর্ষণীয় ছিল। কাজেই তাঁদের ধর্মসংস্কারের কোনো প্রত্যক্ষ ফল কিছু জনমানসে প্রতিফলিত হল না। তাই ধর্মান্দোলনের এই সংকটকালে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঐতিহাসিক কারণেই অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

চতুর্থ কারণ হল—প্রতিক্রিয়াশীল সনাতনধর্মী হিন্দুরা এইসময় সুযোগ বুঝে প্রচণ্ড হুঙ্কারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের রঘুনন্দনী রক্তচক্ষুতে হিন্দু-ধর্মের ও হিন্দুসমাজের ক্ষতি ছাড়া যে লাভ হবে না, তা-ও ধর্মসমন্বয়পন্থী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে ধর্মের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংস অথবা বিবেকানন্দ কখনই সংকীর্ণ সনাতনপন্থী ছিলেন না, সর্বদাই উদার মানবপন্থী ও সমন্বয়পন্থী ছিলেন।

সামাজিক অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে আরও অনেক কারণ উপস্থিত করা যেতে পারে। এই সামান্য প্রস্তাবনায় তার সুযোগ নেই। মোটামুটি এই কারণগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আমাদের দেশের এক কঠিন সংকটকালে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল এবং সেই সংকট থেকে স্বদেশের লোক-চিত্তকে মুক্ত করার জন্যই তিনি হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম তাঁর প্রধান বক্তব্য হলেও, তাঁর সমাজবোধ ও মানবতাবোধ এত প্রখর ও গভীর ছিল যে সমস্ত ধর্মকথার মধ্যে ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বোধহয় তিনি ধর্মের মাধ্যমে সমাজতত্ত্ব ও মানবতত্ত্বের কথাই অধিক বলেছেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য বলে মনে হয়। আজকের স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র তার সংবিধানে 'সোশ্যালিজম্' বা সমাজতন্ত্রের আদর্শকে রাষ্ট্রীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে। এই সমাজতন্ত্রের আদর্শ বোধহয় সর্বপ্রথম স্বামী বিবেকানন্দই সুস্পষ্ট ভাষায় এদেশে জনসমাজে প্রচার করেছেন। সেকথা ভুলে গিয়ে যদি আজ তাঁকে শুধু একজন ধর্মসংস্কারক বা ধর্মপ্রচারক বলে বিচার করা হয়, তাহলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না, বরং তাঁর আদর্শকে এবং জীবনের ব্রতকে খণ্ডিত ও বিকৃত করা হবে।

কথাটা সামান্য একটু বিস্তার করে বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যদি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা (political thought) ও সমাজচিন্তার (social thought) ইতিহাস কোনোদিন লেখা হয়—তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ যে সেখানে কেবল স্বাদেশিকতা ও স্বাজাত্যবোধের অন্যতম উদ্‌বোধক বলে স্থান পাবেন তা নয়, তার সঙ্গে সমানাধিকার ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের প্রথম প্রবক্তার কৃতিত্বও তিনি দাবি করবেন এবং সে-দাবি ঐতিহাসিক বা সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে অস্বীকার করাও সম্ভব হবে না। তাঁর কালে এই আদর্শের কথা নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করতে যে কি প্রচণ্ড পৌরুষের প্রয়োজন হয়েছিল তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারব না কল্পনা করুন, আজ থেকে ৭০।৮০ বছর আগে—বিদেশী ব্রিটিশরাজের একচ্ছত্র রাজত্বের যুগে—কেবল স্বদেশপ্রেমের কথা নয়—তিনি দেশের উচ্চশ্রেণী ও উচ্চসমাজের মুখের উপর বলেছেন

However much you may be strutting in the pride of your birth, you—the upper classes of India—do you think you are alive? You are but mummies .. it is

you who are the real 'walking corpses'. You, the upper classes of India—you are the void, the unsubstantial nonentities of the future....why do you not quickly reduce yourselves into dust and disappear in the air ? (Collected Works, vol. 7—pp. 308-9).

এটি তাঁর বিখ্যাত বাংলা রচনার রূপান্তর, যা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। স্বামীজীর বাংলা রচনা অবশ্য ইংরেজির তুলনায় অনেক কম—কারণ তাঁকে বাংলার বাইরে বেশি করে তাঁর ধর্ম ও সমাজের আদর্শ প্রচার করতে হয়েছে। ধর্মপ্রসঙ্গে তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ও সামাজিক ক্রমবিকাশের যে বিশ্লেষণ করেছেন তার অধিকাংশই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিবাদী, কোথাও তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়া নেই, দুর্বোধ্য তত্ত্বকথা নেই। ভারতের ঐতিহাসিক ধারা বিশ্লেষণ করে তিনি একাধিকবার বলেছেন যে প্রথমে পুরোহিতশ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা, তারপর যোদ্ধাশ্রেণী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রা, তারপর বৈশ্যশ্রেণী অর্থাৎ বণিক ও ধনিকরা দেশে রাজত্ব করেছে ও করছে। কিন্তু ভবিষ্যতের ভারতে শ্রমজীবী শূদ্রশ্রেণী রাজত্ব করবে। তাতে যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং দেশে শান্তি ও সাম্য স্থাপিত হবে এবং আমরা রামরাজ্যে বাস করব তা নয়—আবার নতুন সমস্যা, নতুন অশান্তি, নতুন শক্তি ও দম্ভের খেলা দেখা দেবে। কিন্তু তা হলেও এই পরিবর্তনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। তিনি বলেছেন : 'I am a Socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread ... A redistribution of pain and pleasure is better than always the same persons having pains and pleasures.' ইতিহাসের বিবর্তনধারা এবং সমাজ-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে তাঁর মন যে কতখানি সজাগ ও বাস্তবধর্মী ছিল তা এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এর পরেও কেউ যদি প্রচলিত অর্থে তাঁকে ধর্মপ্রচারক ও সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেন, তা হলে তিনি স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের শাসটুকু বাদ দিয়ে খোলসটিকে বিচার করছেন বলতে হবে। মহাত্মা গান্ধী আজানুলম্বিত কাপড় পরতেন—ভারতের সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থার প্রতীক রূপে। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাস ও গেরুয়া বসনও ছিল সেইরকম—ভারতের জনমানসের প্রতীক। লোভ-হিংসা-বিদ্বেষহীন

সরলতা, শান্তি ও মৈত্রীর পরিধান—ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত। এই বেশ ধারণ করে ভারতের সর্বনিম্নস্তরের মানুষটির কাছেও প্রাণের অভিনন্দন পাওয়া যায়—এ তিনি জানতেন। কিন্তু বৈরাগ্যের বাণী বা ধর্মতত্ত্বের কথা তিনি সেই মানুষের কাছে প্রচার করেননি। প্রচার করেছেন দেশীয় ঐতিহ্যের কথা, দেশাত্মবোধের কথা এবং জাতিভেদহীন শ্রেণীভেদহীন সমাজগঠনের কথা। আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষে যদি আমরা তাঁর সেই আদর্শটিকে স্মরণ করি এবং নিজেদের জীবন ও আচরণে তা যথাসম্ভব প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হই—তা হলেই এই জাতীয় উৎসব করার সার্থকতা আছে—তা না হলে এ-ও একধরনের পৌত্তলিকতা ছাড়া কিছু নয়। আজকের জাতীয় সংকটের দিনে বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধ ও দেশীয় ঐতিহ্যবোধের আদর্শ এবং তাঁর ভেদবৈষম্যহীন ভারতীয় সমাজগঠনের আদর্শ থেকে আমরা খানিকটা প্রেরণা পেতে পারি, যদি ধর্মের গণ্ডির মধ্যে তাঁকে টেনে না নিয়ে যাই।

১৩৬৯-৭০ | ১৯৬২

জয়নারায়ণ ঘোষাল

পলাশীর যুদ্ধ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা দিক্‌স্তম্ভ। পলাশীর আগেও যুদ্ধ হয়েছে অনেক, বিখ্যাত সব যুদ্ধ, কিন্তু কোনো যুদ্ধের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে এমন সুদূরপ্রসারী হতে পারেনি। তার কারণ, বাংলার জাতীয় জীবনেতিহাসের দিক থেকে পলাশীর রণাঙ্গনে সংঘাত হয়েছে দুই যুগের, কেবল দুই জাতের নয়। বিদেশী বণিকের মানদণ্ড যেমন রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে, তেমনি একটা যুগ অস্তাচলে গেছে তার সঙ্গে। সেই যুগটাকে আমরা নবাবী আমল এবং সামন্তযুগ বলতে পারি। অন্যান্য যুগের মতো সামন্তযুগেও আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ভালমন্দ বিচারের একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। নবযুগের নতুন পরিবেশে সেই মানদণ্ড ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে লাগল। বিদেশী ইংরেজ বণিকরা একহাতে আমাদের রাজদণ্ড কেড়ে নিয়ে, আর একহাতে নবযুগের এই নতুন মানদণ্ডটি আমাদের দিয়েছিলেন। অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি—জীবনের কোনোক্ষেত্রেই অবশ্য এই বিদেশী শাসকরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে, নবযুগের এই নতুন মূল্যায়নের মানদণ্ডটি প্রয়োগের অবাধ স্বাধীনতা আমাদের দেননি। তার ফলে আমাদের যুগোপযোগী অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে, মধ্যপথে এসে থেমে গেছে, দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তবু আমরা বহু বাধা-বিপত্তির মধ্যেও জীবনের সবক্ষেত্রে অনেকটা পথ এগিয়ে গেছি। নবযুগের নতুন মানদণ্ড নিয়ে এই অগ্রগমনে, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের

প্রথম পর্বে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত, বাংলা দেশের যে-কয়েকটি পরিবার নানাদিক থেকে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার, শোভাবাজারের রাজ-পরিবার, পাইকপাড়ার রাজ-পরিবার, ভূকৈলাসের রাজ-পরিবার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়নারায়ণ ঘোষাল এই ভূকৈলাস রাজপরিবারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কৃতী বংশধর।

নবযুগের এই নতুন পরিবার-প্রতিষ্ঠাতাদের (Family-founders) এযুগের প্রথম উদ্‌যোগী সংস্কৃতি-রচয়িতা বলা যায়। পরিবারই হল সমাজের ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠিভিত্তি, তাই পরিবার থেকেই নতুন যুগের আলোক বাইরের বৃহত্তর সমাজে বিস্ফুরিত হয়েছে। কেবল যে আমাদের দেশে হয়েছে তা নয়, সবদেশেই হয়েছে। প্রাচীন বা মধ্যযুগে পরিবারের কোনো ইতিহাস ছিল না, তার কারণ জীবন্ত সমাজের সক্রিয় 'সেল' (cell) বা 'ইউনিট' হিসেবে পরিবারের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হত না, কেবল সকলের অধীশ্বর শাসকরাজার পরিবারের অস্তিত্বই স্বীকৃত হত। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণরা যে 'কুলপঞ্জী' রচনা করতেন, তা সামাজিক শুচিতা রক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হত, আর কোনো কাজে লাগত না। পারিবারিক প্রাধান্যের ইতিহাস আধুনিক যুগের ইতিহাস এবং সেইসব পরিবার যে প্রধানত ধনিক পরিবার, বিত্তশালী পরিবার, তার কারণ স্বোপার্জিত বিত্তই এযুগের সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রধান স্তম্ভ। যুগটা ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক নয়। এযুগে বিত্তের কৌলীন্যই স্বীকৃত, কুলের কৌলীন্য নয়। স্বোপার্জিত বিত্তের জোরেই বাংলা দেশে যাঁরা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, এবং সেই প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভূকৈলাসের রাজারা অন্যতম। ইটালীয় ও ইয়োরোপীয় রেণেসাঁসের ইতিহাসেও দেখা যায়, কয়েকটি বিত্তবান পরিবারই নতুন সংস্কৃতিধারার পরিচালক ছিলেন। বাংলা দেশের নবযুগের ইতিহাসেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি।

জয়নারায়ণ ঘোষাল স্বরচিত 'করুণানিধানবিলাস' কাব্যে বংশপরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন

বিষ্ণুর কনীয় সুত কন্দর্প ঘোষাল।
কৈশোরে কিশোর প্রেমে হইল রসাল ॥

ঐ গুণে লোলা অতি হইয়া সদয়া।
দেশাধিপ রাজকার্যে তাঁরে নিয়োজিয়া॥
গোবিন্দপুরেতে বাস দিলেন তাঁহার।
গড্যা বেহালা খিদিরপুরে নিরন্তর॥
তস্য তিন সুত কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম।
গোকুলচন্দ্র রামচন্দ্র অতীব উত্তম॥
তাঁর পাঁচ পুত্র নাম ক্রমে বলি শুন।
বৃন্দাবনচন্দ্র পরে রামনারায়ণ॥
হরিনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ চতুর্থ।
পঞ্চ গঙ্গানারায়ণ হয় হে যথার্থ॥
বিধাধীনে পাঁচজনের বংশ হইল হীন।
কৃষ্ণচন্দ্রের এক পুত্র আমি মাত্র দীন।

পলাশীর যুদ্ধের আগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, জয়নারায়ণের পিতামহ কন্দর্প ঘোষাল, হাওড়া জেলার বাকসাড়া গ্রামের পৈতৃক বাস ছেড়ে নতুন কলকাতা শহরে গোবিন্দপুর অঞ্চলে উঠে আসেন। এখন যেখানে ফোর্টউইলিয়ম কেল্লা প্রতিষ্ঠিত, পূর্বে তার নাম ছিল গোবিন্দপুর। ভাগীরথীর পশ্চিমতীর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রথমে যাঁরা নতুন মহানগরে ভাগ্যান্বেষণে আসেন, তাঁরা এই গোবিন্দপুর অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেন। কলকাতার প্রাচীন বনেদী পরিবারের পূর্বপুরুষরা অনেকেই গোবিন্দপুরের আদিবাসিন্দা। নতুন কেল্লা নির্মাণের সময় এঁরা উত্তরে ও দক্ষিণে জমিজমা পেয়ে চলে যান। শেঠ বসাকরা, ঠাকুর ও শোভাবাজারের দেবরা যান উত্তরে সুতানুটিতে, ঘোষাল পরিবার ও অন্যান্য আরও অনেকে যান দক্ষিণে বেহালা সরশুনার দিকে। কিছুদিন গড়-বেহালা অঞ্চলে বাস করে কন্দর্প ঘোষাল, ১১৬১ সনে পলাশীর যুদ্ধের আগে খিদিরপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। প্রায় ২০০ বছর অর্থাৎ আটপুরুষ ধরে, ভূকৈলাসের রাজারা বংশানুক্রমে খিদিরপুরে বাস করছেন। জয়নারায়ণের জন্ম হয় গোবিন্দপুরে, ১৭৫১ সালে, পলাশীর যুদ্ধের ছ'বছর আগে।

কন্দর্পের কালে ভূকৈলাসের রাজপরিবারের বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠা ছিল না, থাকবার কথাও নয়। তাঁর মধ্যমপুত্র, জয়নারায়ণের পিতৃব্য গোকুলচন্দ্র ঘোষালই

এই পরিবারের আদিপ্রতিষ্ঠাতাদের শীর্ষস্থানীয়। কুলগত বৃত্তি ছেড়ে তিনিই প্রথম স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই বৃত্তিনির্বাচনে তিনি যুগধর্মই পালন করেছিলেন। সামন্তযুগে বৃত্তি ছিল কুলগত ও বংশানুক্রমিক। যাজন অধ্যাপন শাস্ত্রব্যবসায় ছাড়া ব্রাহ্মণরা অন্য ব্যবসা করলে সমাজে পতিত হতেন। কায়স্থরা প্রধানত রাজস্ববিভাগে ও জমিদারের কাছারীতে চাকরি করতেন। বাণিজ্য তাঁদেরও কুলগত পেশা ছিল না। বাণিজ্য করতেন স্বুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক, তন্তুবণিক প্রভৃতি বণিকশ্রেণী। সামন্তসমাজে বণিকবৃত্তির মর্যাদা ছিল ন'। নবযুগে বণিকবৃত্তির মর্যাদা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হল। অবাধ বাণিজ্যের উদ্যমের মধ্যে যুগধর্মের প্রকাশ হতে থাকল। পলাশীর যুদ্ধের পর, কলকাতার তথা বাংলার সমাজে এই যুগধর্মের• প্রকাশ হয়েছিল বাঙালী 'বেনিয়ানদের' মধ্যে। এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ও স্বাধীন ইংরেজ বনিকদের 'এজেণ্ট' ও দালাল ছিলেন বাঙালী বেনিয়ানরা। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বেনিয়ানরাই ছিলেন একাধারে 'interpreter, head book-keeper, head-secretary, head-broker, the supplier of cash and cash-keeper'। 'টু মেন ধাপুড়-ধুপুড়, ওয়ান ম্যান সেঁকে দেয়'—গোছের (ঢেঁকির বর্ণনা) ইংরেজি বিদ্যের জোরে সেযুগে যে প্রতিপত্তি তাঁরা অর্জন করে গেছেন, এযুগের ইংরেজি বুলিদুরস্তদের কাছে তা রূপকথা বলে মনে হবে। পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ব্রাহ্মণ বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে বিশেষ কেউ কুলবৃত্তি ছেড়ে বাণিজ্যের এ-পথে অগ্রসর হননি। তখন কলকাতার বাঙালী শেঠবসাকরাই প্রধানত 'এজেণ্টের' কাজ করতেন। পলাশীর পরে কুলবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন করে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থরা স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হন এবং বুদ্ধিবলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা পান। গোকুল ঘোষালের সমসাময়িক বেনিয়ানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বারানসী ঘোষ, হৃদয়রাম ব্যানার্জি, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জি, মদন দত্ত প্রভৃতি। এঁদের সমকক্ষ প্রতিপত্তিশালী বেনিয়ান তখন খুব অল্পই ছিলেন।

গোকুল ঘোষাল ছিলেন গবর্ণর ভেরেল্‌স্টের বেনিয়ান। মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক তিনি এবং তাঁর প্রতিপত্তিও নবকৃষ্ণের সমতুল্য ছিল। সেকালের 'মেয়র্স কোর্টের' দলিলপত্র থেকে গোকুল ঘোষালের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অবিশ্বাস্য মনেহয়। বাংলা দেশে ও বাংলার বাইরে প্রায় সর্বপ্রকারের পণ্যের বাণিজ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন। নানারকমের

কাপড়চোপড়, মসলিন মলমল, আফিম তামাক, কাঠ চিনি ইত্যাদি কোনো কিছুই বাদ ছিল না। সাহেব সমাজে ও ধনিক বাঙালী সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ১৭৭৯ সালে গোকুল ঘোষালের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ পিতার মতো কৃতীপুরুষ হতে পারেননি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালই তাঁর কৃতিত্বের ধারা ভিন্নক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাঙালী বেনিয়ানদের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতি হওয়া উচিত ছিল আধুনিক ক্যাপিটালিস্ট বা শিল্পপতিশ্রেণীর বিকাশে। ধনতন্ত্রের প্রথমপর্বের প্রয়োজনীয় বিত্তসঞ্চয়, 'primary accumulation,' প্রচুর পরিমাণে তাঁরা করেছিলেন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠায় সেই সঞ্চিত বিত্তের নিয়োগ একান্ত কাম্য ছিল। কিন্তু এদেশী বেনিয়ান-বণিকদের সে-কামনা ইংরেজ শাসক-বণিকদের স্বার্থে চরিতার্থ করা সম্ভব হয়নি। নবযুগের বেনিয়ান-বণিকেরাও তাই শেষপর্যন্ত স্থাবর ভূসম্পত্তি কিনে জমিদারশ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন, ইয়োরোপের বণিকদের মতো শিল্পপতিশ্রেণীতে উন্নীত হতে পারেননি। বাংলা দেশের একটা গতিশীল সামাজিক শ্রেণী এইভাবে স্থিতিশীল শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে।

গোকুল ঘোষাল প্রচুর অর্থব্যয় করে ধনসম্পত্তি কিনেছিলেন। জয়নারায়ণ ঘোষাল পিতৃব্যের বেনিয়ানি ও বাণিজ্যবৃত্তি অনুসরণ করেননি। তিনি প্রধানত সরকারী চাকরি করে বিপুল ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। সংস্কৃত, বাংলা, ফারসী, হিন্দী, ইংরেজি ভাষা অল্পবয়সে শিখে, তিনি যৌবনেই দায়িত্বশীল রাজকার্যের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজ মহলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল এবং তখনকার পদস্থ ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ সাহায্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে লাভবানও হয়েছিলেন। ভূসম্পত্তির মালিকানা ও নিশ্চিন্ত চাকুরিজীবন জয়নারায়ণকে কূপমণ্ডুক করে তোলেনি। জীবনের ও সমাজের নতুন অভাব, নতুন প্রয়োজন তিনি স্বীকার করতেন ও বুঝতেন যুগধর্মের বিরুদ্ধাচরণ তিনি সাধারণত করেননি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হয়েও ধর্মান্ধ গোঁড়ামিকে তিনি খানিকটা বর্জন করে চলেছেন। এই উদার প্রগতিশীল দৃষ্টি-ভঙ্গির জন্যই জয়নারায়ণ নবযুগের বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দেবদেবালয় জয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক, দানধ্যানেও কার্পণ্য করেননি। কিন্তু তার জন্য তিনি শ্রদ্ধেয় হলেও, স্মরণীয় নন। সেকালের

রাজারাজড়া ও জমিদাররা অনেকে এই মহৎ কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের মহত্ত্বের সেইসব নিদর্শনের সঙ্গে তাঁদের নামও প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ইতিহাসে তাঁদেরই স্বাক্ষর অক্ষয় হয়ে থাকে, যাঁরা তার সম্মুখগতিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। জয়নারায়ণ তাই করেছিলেন বলেই স্মরণীয় কিভাবে করেছিলেন, তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আধুনিক যুগোপযোগী শিক্ষার প্রতি জয়নারায়ণের কতখানি অনুরাগ ছিল, কাশীতে তাঁর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীর বিদ্যালয়ে পাঠারম্ভ হয় ১৮১৮ সালের ১৭ জুলাই থেকে। জয়নারায়ণের এই বিদ্যালয় প্রসঙ্গে রেভারেণ্ড লঙ সাহেব লিখেছেন

> Banares, the city of temples and citadel of idolatry, the Athens for Hindu students from various parts of India, was one of the first places in India where a Hindu came forward to offer an English education to his countrymen, and to connect it also with the Holy Scriptures.

কলকাতা শহরে তার আগেই ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়েছে। ১৮১৭ সালে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার প্রধান বিদ্যায়তন হিন্দু কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, প্রধানত এদেশবাসীদের উদ্যোগেই। কিন্তু বাংলা দেশের বাইরে, কাশীর মতো প্রাচীন বিদ্যাতীর্থে, আধুনিক শিক্ষার আলোকবর্তিকা একজন বাঙালীই বহন করে নিয়ে যান, তিনি জয়নারায়ণ ঘোষাল ধর্মপ্রাণ হিন্দু হয়েও তিনি কিভাবে চার্চ মিশনারী সোসাইটির সংস্পর্শে এসে, কাশীর স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তার বিচিত্র কাহিনী জয়নারায়ণ নিজেই একখানি চিঠিতে বর্ণনা করে গেছেন। চিঠিখানি তিনি লণ্ডনের চার্চ মিশনারী সোসাইটিকে লিখেছিলেন, ১৮১৮ সালে। সেই দীর্ঘ ইংরেজি চিঠির মর্ম এই

> কয়েক বছর হল আমি অসুস্থ হয়ে কলকাতা ছেড়ে কাশীবাস করছি। অনেক চেষ্টা করেও সুস্থ হতে পারিনি। জোনাথান ডানকান তখন কাশীর 'রেসিডেন্ট এজেন্ট', তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ইয়োরোপীয় সার্জেনদের দিয়ে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু তাতেও আমার নিরাময় হয় না। এইসময় শুনতে পাই আর একজন হিন্দু ভদ্রলোক

হুইট্লি নামে এক সাহেব-বণিকের উপদেশ মেনে নাকি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন। আমিও হুইট্লি সাহেবের শরণাপন্ন হলাম; তিনি আমাকে একখানি New Testament ও Book of Common Prayer দিলেন, পড়তে বললেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করলেন। এইসময় তিনি প্রায়ই আমার কাছে আসতেন এবং খ্রীস্টিয় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতেন। অনেক চিঠিপত্রও তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ে লিখেছেন। ওষুধ-পত্তর তিনি বিশেষ আমাকে দেননি, সামান্য দু'একটা বলে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কথামতো চলে আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হই। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি—'যীশুখ্রীস্টের জন্য আমি কি করতে পারি বলুন?' তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য এবং সর্ববিদ্যা ও সর্বভাষা শিক্ষার জন্য আপনি যদি কাশীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলেই খ্রীস্টসেবা করা হবে। তাঁর কথাতেই আমি স্কুল প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হই। ·· হুইট্লি সাহেবের কাছে রেভারেণ্ড সাহেবের কথা প্রায় শুনতাম। মনে মনে কামনা করতাম যদি তিনি কাশী আসেন, তাহলে স্কুলের ভার তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। অবশেষে তিনি কাশীতেই এলেন। তাঁর কাছে চার্চ মিশনারী সোসাইটির কথা সব শুনি এবং তাঁদের কার্যাবলীর রিপোর্ট পাঠ করার সুযোগ পাই। তারপরেই সিদ্ধান্ত করি যে চার্চ মিশনারী সোসাইটির কলকাতা কমিটির উপরেই স্কুলের দায়িত্ব দেব এবং তাঁদেরই স্কুল-পরিচালনার জন্য যে-সম্পত্তি আমি দান করেছি, তার ট্রাস্টি করব। এর মধ্যে অবশ্য, ৪৮০০০ হাজার টাকা দিয়ে বাঙালী টোলায় যে বাড়ি আমি তৈরি করেছি, সেই বাড়িতে একটি স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং অ্যাডলিঙটন সাহেব সেখানে ইংরেজি পড়ান। এইভাবে আমার দীর্ঘদিনের কামনা সার্থক হতে চলেছে। কিন্তু কেবল স্কুল-প্রতিষ্ঠা করেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আমার বিশ্বাস, আধুনিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য কাশীতে অবিলম্বে একটি Printing Press প্রতিষ্ঠা করা দরকার। প্রেস না হলে স্কুলপাঠ্য নতুন নতুন বই ছাপা সম্ভব হবে না এবং শিক্ষার বিস্তারও হবে না। শিক্ষার প্রসারের জন্য ছাপাখানা অবশ্য প্রয়োজন। আমার তাই একান্ত ইচ্ছা, চার্চ মিশনারী সোসাইটি যত শীঘ্র সম্ভব কাশীতে একটি Press নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করুন এবং

একজন কি দু'জন ভালো মিশনারী কর্মী পাঠান প্রেস তদারক করবার জন্য। যাঁদের তাঁরা পাঠাবেন তাঁরা যেন বিদ্বান ব্যক্তি হন, আধুনিক ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যেন তাঁদের বিশেষ জ্ঞান থাকে, কারণ কাশী এদেশের প্রাচীন বিদ্যাসমাজ, বহু পণ্ডিতের বাস এখানে। এঁদের জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তির ক্ষমতা থাকার দরকার তাঁদের। তা যদি তাঁরা করতে পারেন এবং স্কুলের সঙ্গে যদি একটি প্রেস প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে আমার বিশ্বাস শ্রীরামপুরের মিশনারীদের মতো এবং কলকাতার স্কুলবুক সোসাইটির মতো কাশীতেও আমরা আধুনিক শিক্ষার প্রসারে সফল হব।

আদালতের রেকর্ডস্তূপে ও অন্যান্য স্থানের দলিলপত্রে ভূকৈলাসের রাজপরিবার সংক্রান্ত যত নথিপত্র আছে এবং এখনও যা পাওয়া যায়, তার মধ্যে আমার ধারণা, জয়নারায়ণ ঘোষালের এই পত্রখানির ঐতিহাসিক মূল্য ও তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি। এই পত্রের মধ্যে জয়নারায়ণের চরিত্র যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমন আর কোনখানেই হয়নি। নিজে হিন্দু হয়েও এবং হিন্দুধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আস্থা রেখেও, তিনি ভিন্নধর্মের প্রতি কত শ্রদ্ধাবান ছিলেন, এই চিঠি থেকে তা বোঝা যায়। এ-উদারতা তখনকার হিন্দুসমাজে খুবই দুর্লভ ছিল। উদারতার সঙ্গে তিনি যে মানসিক বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন পত্রে, তা-ও যে-কোনো বিদ্রোহীর বলিষ্ঠতার সঙ্গে তুলনীয়। দেবদেবালয় প্রতিষ্ঠায় ও ধর্মচিন্তায় মগ্ন থেকেও, তিনি যুগোপযোগী প্রত্যেক সমস্যা সম্বন্ধে, বিশেষ করে আধুনিক-শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে, কত গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তা তাঁর বিদ্যালয়সহ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার আগ্রহ থেকে বোঝা যায়। কেবল ইংরেজি বিদ্যালয় নয়, ছাপাখানার ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে এই চেতনা এদেশের খুব অল্প লোকের মধ্যেই ছিল। রামমোহনের যুগের প্রথম পর্বে, রামমোহনের প্রগতিশীল ভাবধারার অন্যতম সমর্থক ও বাহক ছিলেন জয়নারায়ণ।

বাংলা ১১৫৪ সনে, ইং ১৭৮৭ সালে, পিতা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে জয়নারায়ণ কলকাতায় অনাথ আশ্রম ও 'ইনডাস্ট্রি হাউস' প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নর-জেনারেলকে যে পত্র লেখেন তা-ও তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অক্ষম ও বেকারদের জন্য 'ইনডাস্ট্রি হাউসের' পরিকল্পনা ইংলণ্ডে করা হলেও, তখন এদেশের ইংরেজরাও তা ভাবতে পারেননি।

জয়নারায়ণের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না, কারণ

সে-আলোচনা বিস্তৃত না হলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। তাঁর 'করুণানিধানবিলাস' কাব্য সম্বন্ধে কেবল একটি কথা বলব। ১২২১ সনে, অর্থাৎ ১৮১৪ সালে জয়নারায়ণ এই কাব্য রচনা শেষ করেন। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য হলেও, লীলার ক্ষেত্র বাংলা দেশ এবং কাল আধুনিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবি শ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির বিস্তৃত বিবরণ 'করুণানিধানবিলাস' কাব্যে আছে। সেকালের বাংলার উৎসব-পার্বণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্মকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ের একখানি আকরগ্রন্থ করুণানিধানবিলাস।

১৮২১ সালে, বাংলা ১২২৮ সনের ২৫ কার্তিক জয়নারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল, কালীশঙ্করের পুত্রদের মধ্যে সত্যকিঙ্কর, সত্যচরণ ও সত্যশরণ ঘোষাল, এই প্রগতিশীল ভাবধারাকে যতদূর সম্ভব সর্বক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে গেছেন। হিন্দু কলেজে কাশীতে ২০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। রামমোহনের 'আত্মীয় সভার' সঙ্গে কালীশঙ্করের সংযোগ ছিল এবং ভূকৈলাসের রাজবাড়িতে মধ্যে মধ্যে 'ব্রাহ্মসমাজের' বৈঠকও হত। সেকালের অন্যতম বিদ্বৎ-সভা 'গৌড়ীয় সমাজের'ও অধিবেশন হত এই রাজবাড়িতে। বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক প্রগতিশীল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভূকৈলাসের রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের সংযোগ ছিল। নবযুগের বাংলার ইতিহাসে প্রধানত এই কারণেই তাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন।

১৯৬০

অটোমেটিক জীবন ও সমাজ

পাত্‌লুন আঁটলুম্‌, বড়লোক চাটলুম, তারপর কী? কী? কী? জিজ্ঞাসা করেছেন, আধুনিক কবি। কিছুই না। জীবনটা খাড়া-বড়ি-থোড়! খাড়া-বড়ি-থোড়! খাড়া-বড়ি, খাড়া-বড়ি, থোড়-থোড়-থোড়।

হয়ত তাই। হয়ত কেন, সত্যিই তাই। পৃথিবীতে যত সমুদ্র, তত বালুতট এবং সমস্ত বালুতটে যত বালুকণা আছে তার একটিমাত্র বালুকণা—মানুষ। সেই বালুকণার জীবন নিয়ে এত প্রশ্ন কেন? জীবনটা যদি সত্যই খাড়া-বড়ি-থোড় হয়, জেম্‌স জয়েসের (James Joyce) ভাষায়—'their weatherings and their marryings and their buryings and their natural selections'—'a humanpest cycling (pist!) and recycling (past!)'—তাহলে এত প্রশ্ন কেন? যেহেতু বালুকণাগুলো বালু নয়, মানুষ—এবং বালুতটে আমরা বাস করি না, বাস করি জীবনের তটে—সমাজে।

থোড়-বড়ি-খাড়া ছন্দ চক্রবৎ ঘূর্ণনের ছন্দ। পিস্টনের ছন্দ, বৈদ্যুতিক হাতুড়ির ছন্দ। যন্ত্রযুগের সমাজের যান্ত্রিক ছন্দ। যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাবকালে সত্যদর্শী অনেক কবি তাকে কাব্যে রূপায়িত করতে চাননি। ওয়াল্ট হুইটম্যান বা টেনিসন সকলে নন এবং প্রবল উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা হুইটম্যানের মতো 'হু-র্‌রে' বলে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে অভিনন্দন জানাননি

Hurrah for positive science !
long live exact demonstration !

এডগার অ্যালান পো-র (Edgar Allan Poe) মতে কেউ-কেউ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ-কুৎসিত রূপ প্রত্যক্ষ করে তাকে—'vulture whose wings are dull realities'—বলে বর্ণনা করেছিলেন। যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে ব্যস্তবাগীশ জীবনের কথা ভেবে ম্যাথু আর্নল্ডের মতো যাঁরা বলেছিলেন

this strange disease of modern life
with its sick hurry, its divided aims—

তাঁদের কথা সত্য হয়েছে কি মিথ্যে হয়েছে, তা নিয়ে তর্কের অবতারণা করে লাভ নেই, কারণ তর্কে সব 'বস্তু' মেলে না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে কোনো কবি ও শিল্পী উপেক্ষা করেননি। মানুষের জীবন ও সমাজকে অনেক সংকীর্ণতা থেকে বিজ্ঞান যে মুক্তি দিয়েছে এ-কথা উনিশ শতকের শিল্পী ও দার্শনিকরা জানতেন, এবং আজকের বিশ শতকের শিশুরাও তা জানে। সমস্যাটা বিজ্ঞান বা যন্ত্র নিয়ে নয়, যন্ত্রের ক্রীতদাস মানুষকে নিয়ে। বহু যুগের শিশু-মানুষ বিজ্ঞানের প্রচণ্ড শক্তি আয়ত্ত করে হঠাৎ যেদিন যৌবনে পদার্পণ করল, সেদিন সেই শক্তির দাসত্বের কথা তার সুদূর কল্পনাতে স্থান পায়নি। কিন্তু যন্ত্রযুগের অগ্রগতি যত দ্রুত হতে থাকল তত গোলামের প্রভাব বাড়তে লাগল প্রভুর উপর। বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যত উন্নতি হল, মানুষের তত উন্নতি হল না। বৈজ্ঞানিক শক্তি বিকাশের তালেতালে মানবিক শক্তির অবনতি ঘটতে লাগল। দুর্বৃত্তের হাতে ধারাল অস্ত্র দিলে যা হয়, অথবা দুষ্টবুদ্ধি বালকের হাতে আগুন, মানুষের হাতে বিজ্ঞানেরও অবস্থা হল তাই। সুতরাং অপরাধটা বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞানীর নয়, যন্ত্রের নয়, যন্ত্রীরও নয়—অপরাধ মানুষের স্বভাবের ও প্রবৃত্তির। সমস্যাও বিজ্ঞান বা যন্ত্রের নয়—সনাতন মানুষের।

দেখা গেল, মানুষের জীবনের নিভৃততম কোণটি পর্যন্ত যন্ত্র চুপিসাড়ে প্রবেশ করেছে। যন্ত্রের মতো মানুষও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। সম্প্রতি এই যন্ত্রের জীবনেও যুগান্তকারী সব ঘটনা ঘটছে। অনেক বিস্ময়কর যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এতদিন, অনেক অসাধ্যসাধনও তারা করেছে, কিন্তু পদে-পদে তাদের কর্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে যন্ত্রকুশলী শ্রমিক, টেকনিশিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ার। যন্ত্র এবারে নিজেই

সাবালক হয়ে উঠছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিপ্রহরে যন্ত্র পরনির্ভর না-হয়ে ক্রমেই আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে। বর্তমান যুগ স্বয়ংক্রিয় আত্মনির্ভর যন্ত্রের যুগ অর্থাৎ অটোমেটিক যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তা (automation) যত দ্রুত বাড়ছে, তত যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্কটুকু দিন-দিন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রের উপর মানুষের যেটুকু 'কন্‌ট্রোল' ছিল, তা-ও আর থাকছে না। মানুষের মতো যন্ত্রও আজ তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করছে। কিন্তু মানুষ যখন তার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হচ্ছে, তখনই ঠিক যন্ত্র হয়ে উঠেছে আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। এই দুইটি ঘটনার সমাবেশ—মানুষের স্বতন্ত্রতা বর্জন এবং যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য অর্জন—সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে বোধহয় সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মানুষ এখনও সচেতন নয়, কারণ পরিবর্তনের দ্রুততা এত ক্ষিপ্র ও অপ্রত্যাশিত যে চেতনান্তরে তা সহজে দাগ কাটতে পারছে না। তা না পারলেও, যান্ত্রিক অটোমেশনের প্রবল সামাজিক প্রতিক্রিয়া তার জন্য বন্ধ হয়ে থাকবে না। দ্রুত পরিবর্তনের সময় সামাজিক চেতনার প্রবাহ সহজে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে না। ধীরেসুস্থে চেতনার তরঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে এবং যখন বাইরের পরিবর্তনের আঘাতে তাতে ঢেউ ওঠে, তখন চোখ মেলে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় যে তার বাহিরে তো বটেই, পুরনো অন্তরটা পর্যন্ত ক্ষয়ে-ক্ষয়ে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বলা যায় না আমাদের আধুনিক যুগের এই উনিশ-শতকী পুরনো অন্তরটা এরই মধ্যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে কি না। বলা যায় না! অনুভূতিতে মনে হয়, সেই সব সুন্দর-সুন্দর নিটোল আদর্শ, ভাব-অনুভাব, ধ্যান-ধারণা, যা দিয়ে শতবর্ষ আগে বিজ্ঞানের শৈশবকালে মানুষ তার মানসলোকে স্বর্গ-রচনা করেছিল, আজ বিজ্ঞানেরই অভিশাপে সেই স্বর্গ থেকে সে নির্বাসিত হয়েছে। অনেক সোনার স্বপ্ন, অনেক হীরের টুকরো সব ধারণা, অনেক নীলকান্তের মতো নীতিকথা, অনেক গিরিশৃঙ্গের মতো উত্তুঙ্গ সব মানবিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ—সব একে-একে যন্ত্রের নির্মম ঘর্ঘর শব্দে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কবি টি. এস. এলিয়টের কাল-যন্ত্রের (Time Machine) চেয়ে কঠোর এই যন্ত্র, কারণ আধ্যাত্মিক কবি-কল্পনা-মণ্ডিত নয় তার রূপ। এ-যেন কতকটা জেমস জয়েসের 'হোলমোল মিলহুইলিং ভিকো-সাইক্লোমিটার' ('Wholemole Millwheeling Vicociclometer')—যে ভিকোসাইক্লোমিটার যন্ত্রের

খাঁজকাটা চক্রে বিদ্ধ হয়ে আমরা—সমাজের সোনারচাঁদ ছেলেরা থেকে আরম্ভ করে বাতিল বাউণ্ডুলেরা পর্যন্ত—সতত ঘুরপাকি খাচ্ছি। এবং জীবনের চারিদিকে একটি বিষাক্ত বৃত্ত' (vicious circle) রচনা করে, তার মধ্যে বন্দী হয়ে পরম আত্মতৃপ্তি লাভ করছি।

চক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান ভিকোসাইক্লোমিটারের যুগে আমরা পৌঁছে গেছি বললেও ভুল হয় না। আজকের যুগকে কেবল যন্ত্রযুগ বললে সবটুকু বলা হয় না। বলা উচিত 'অটোমেটিক যন্ত্রের যুগ' বা 'অটোমেশনের যুগ'। এর মধ্যে যান্ত্রিক অটোমেশন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রবিদ্, টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি, শ্রমিক প্রভৃতি সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অটোমেশনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া যদি একমুখী বা দ্বিমুখী হত, তাহলে এত বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ত হত না। এ কেবল বিস্ময়ের উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য নয়, মানুষের বুদ্ধির চরম বিকাশকালে তার ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলার উত্তেজনা। মনেহয় যেন, মানুষের পর্বতপ্রমাণ বুদ্ধির গলার পিছন থেকে কে অজ্ঞাতসারে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধি যখন স্পুৎনিকের দম নিয়ে আকাশ ফুঁড়ে উড়তে চাইছে, তখনই আবার ডানাকাটা বলাকার মতো মাটিতেই আছড়ে পড়তে চাইছে সে, এবং বুদ্ধিবিভ্রম ঘটছে পদে-পদে। যান্ত্রিক অটোমেশন যে মানুষের ক্ষুরধার বুদ্ধির বিজয়অভিযানের অকাট্য প্রমাণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিন্তু কোন্ রাজ্য এবং কার রাজ্য জয়ের অভিযান এই অনমুমেয় অটোমেশন ? কার জন্য অটোমেশন, কিসের জন্য অটোমেশন ?

এ-প্রশ্ন আজ মানুষের মনে জেগেছে এবং যত দিন যাচ্ছে তত প্রশ্নটি জটিলতর হয়ে উঠছে। সমাজে যখন কোনো সমস্যা দেখা দেয় তখন সমাজের নানাশ্রেণীর লোক নানাদিক থেকে সেই সমস্যার ব্যাখ্যা-বিচার করতে চেষ্টা করে। অটোমেশনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নানাশ্রেণীর লোকের নানা মতের কলরব শোনা যাচ্ছে অটোমেশন কেন্দ্র করে। কয়েকটির পরিচয় দিচ্ছি। প্রথমে ধনিকশ্রেণীর কথা বলব। আজকের টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতি প্রধানত ধনিকদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পোষকতার জন্য যে সম্ভব হয়েছে, একথা বোধহয় গরীবরাও অস্বীকার করবেন না। ধনিকশ্রেষ্ঠ আমেরিকার শিল্পপতিরা অটো-মেশনকে সানন্দে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন[১]

We stand on the threshold of a golden future. The

worker should await it with hope ; not fear. Automation is the magic key to the creation of wealth, and not a crude instrument of destruction ; the worker's talent and knowledge will continue to be rewarded in the coming fabulous earthly paradise served by the infallible, tireless activity of automation, guided by electronic instruments, the magic carpet of our free economy is advancing towards horizons of which we have never even dreamed.

আমেরিকার শিল্পপতিদের বক্তব্য হল: আমরা এক স্বর্ণযুগের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। অটোমেশন সেই স্বর্ণযুগের অগ্রদূত। শ্রমিকদেরও তার প্রতীক্ষায় থাকা উচিত—আশান্বিত হয়ে, সন্ত্রস্ত হয়ে নয়। অটোমেশন হল সেই সোনার চাবিকাঠি যার স্পর্শে অফুরন্ত সম্পদ উৎপন্ন হবে, কোনো কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে না। ভবিষ্যতের অটোমেশনের যুগের ভূস্বর্গে দক্ষ শ্রমিকদের জ্ঞানবিদ্যার ও প্রতিভার কদর বাড়বে ছাড়া কমবে না। অটোমেশনের অভ্রান্ত ও অক্লান্ত কর্মকুশলতায় ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, আমাদের অবাধ অর্থনীতির 'ম্যাজিক কার্পেট' এক নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে, আগে যার স্বপ্নেও আমরা নাগাল পাইনি কোনোদিন।

মার্কিন শিল্পপতি-সমিতির অটোমেশনের ভূস্বর্গের এই ব্লুপ্রিণ্ট-এ 'শ্রমিক'দের লক্ষ্য করে অনেক আশার বাণী শোনানো হয়েছে। ধান ভানতে শিবের গীত নিশ্চয়ই তাঁরা গাননি, শোনানোর উদ্দেশ্য একটা কিছু আছে। মুনাফা-প্রণোদিত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অটোমেশন আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হতে পারে। যে-যন্ত্র মানুষ চালাত, সেই যন্ত্র কেবল সুইচ টিপে দিলে যখন নিজেই চলতে থাকবে, তখন মানুষ অচল হয়ে যাবে। এই অচল মানুষেরাই হল কলকারখানার শ্রমিকরা। যে শিল্পকারখানায় আগে দশহাজার শ্রমিক কাজ করত এবং প্রত্যেকে আটঘণ্টা করে কাজ করে যা উৎপাদন করত, সেই কারখানায় যখন সব অটোমেটিক যন্ত্র চলতে থাকবে, তখন হয়তো একহাজার দক্ষ শ্রমিক তার দ্বিগুণ পণ্য উৎপাদন করবে। সুতরাং অটোমেশনের ফলে ধনপতি মুনাফাখোরেরা এক ভয়ঙ্কর উভয়সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। একদিকে

বিকট বেকারসমস্যা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মতো হাঁ করে তাঁদের গিলতে আসছে। অন্যদিকে উৎপন্ন পণ্যপ্রাচুর্যের ফলে বাজারে তার আমদানি চাহিদা ছাড়িয়ে উপচে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। মুনাফার অঙ্ক ঠিক রাখার জন্য তৈরি বাজারদরের কৃত্রিম বাঁধও সেই প্রাচুর্যের ফলে মূল্য-হ্রাস এবং যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তার ফলে কর্মী-ছাঁটাই বা বেকারসমস্যা। এই দুই সংকটের সাঁড়াশি আক্রমণে ধনিক প্রভুরা আজ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। শিল্পপতিদের ব্লুপ্রিণ্টে তাই বলা হয়েছে, শ্রমিকদের আহ্বান করে, 'অটোমেশনের জন্য তোমরা ভয় পেয়ো না, আমরা তাই দিয়ে ভূস্বর্গ রচনা করব।'

অটোমেশন-ভূস্বর্গের খবর এর মধ্যেই কিছু পাওয়া গেছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের (A.F.L.) আন্তর্জাতিক সেক্রেটারি ডেলানে (Delaney) বলেছেন [২]

> **The new machinery can free man from routine and the monotony of labour, but it can also deprive him of work and wages. It can substantially improve living standards and create general abundance, but it can also be the cause of growing surpluses which cannot be utilised because the consumer will not have the necessary purchasing power. It is at present impossible to say whether automation will lead to abundance, or on the contrary, to poverty.**

নতুন অটোমেশনযন্ত্র মানুষকে মেহনতের রুটিন ও একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতে পারে যেমন, তেমনি তাকে কর্ম ও মজুরি থেকে বঞ্চিতও করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রার স্তরের উন্নতি ও প্রাচুর্যের সৃষ্টি হতে পারে যেমন, তেমনি আবার প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষের আর্থিক অনটনের জন্য তা ভোগে না লাগতে পারে। এইজন্য এখনই ঠিক বলা যায় না যে অটোমেশনের সামাজিক ফলাফল কী হবে না-হবে।

আমেরিকার বিখ্যাত গণিতবিদ্ মানসযন্ত্রবিদ্যার (Cybernetics) অন্যতম প্রবর্তক, অধ্যাপক নর্বার্ট ওয়াইনার (Narbert Weiner) অটোমেশনের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে বলেছেন* 'It is perfectly clear that

this (অর্থাৎ অটোমেশন) **will produce an unemployment situation with which........even the depression of the 1930's, will seem a pleasant joke'.** অটোমেশন অদূর ভবিষ্যতে এমন ভীষণ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করবে, যার কাছে ১৯৩০-এর ঐতিহাসিক সংকটের কথা মনে হবে একটা মনোরম মস্করার মতো।

মজুরনেতা ও ম্যাথামেটিসিয়ান, কারও ভবিষ্যবাণী হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ১৯৫৫ সালে আমেরিকার ক্লীভল্যাণ্ডের একটি আধা-অটোমাইজড কারখানায় ২০০ শ্রমিক প্রতিদিন খেটে ১০০০ রেডিও-সেট তৈরি করত। ১৯৫৮ সালের মধ্যে কারখানাটি পুরো অটোমাইজড হবার ফলে মাত্র চারজন ইঞ্জিনিয়ার গোটা কারখানার কাজ চালাচ্ছে। ১৯৫৩ সালের শেষে আমেরিকায় মন্দা-বাজারের ভাঁটার টানে পিট্সবার্গের লোহা-ইস্পাতের কারখানায় প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। কারখানা, বলাবাহুল্য, অনেকখানি অটোমাইজড, তাই পরে ১৯৫৫ সালেই দেখা যায় যে কারখানার উৎপাদন বেড়েছে কিন্তু ১৪,০০০ বেকার শ্রমিককে কাজে পুনর্নিয়োগ করা হয়নি।[৪] আমেরিকার তৈল-পরিশোধন কারখানায় অটোমেশনের ফলে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে, কর্মীর সংখ্যা ১৪৭,০০০ জন থেকে ১৩৭,০০০ জন হয়েছে, অর্থাৎ দশহাজার কর্মী বেকার হয়েছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন বেড়েছে আগের তুলনায় শতকরা ২২ ভাগ, প্রায় একচতুর্থাংশ। তাছাড়া, বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন যে অদূর ভবিষ্যতেই, অটোমেশন-ইলেকট্রনিক-সাইবারনেটিক্স ইত্যাদির অগ্রগতির ফলে, বর্তমানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কার্যপরিচালনার জন্য সেক্রেটারি, ডেপুটি-অ্যাসিসট্যাণ্ট, স্টেনো-টাইপিস্ট-ক্লার্ক, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, অডিটার, বুক-কিপার প্রভৃতির যে বিপুল কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে, তার শতকরা ৮০ ভাগ, অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চারভাগ ছাঁটাই করে দিলেও কাজকর্ম স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, আটকাবে না।[৫] অটোমেশনের জন্য কেবল মজুর-টেকনিসিয়ান-ইঞ্জিনিয়াররা নয়, আপিসের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা পর্যন্ত কর্মচ্যুত হবে। আধুনিক অর্থনীতির অন্তঃসারশূন্য বাক্‌চাতুরীতে এই বেকারসমস্যাকে বলা হয় **'technological unemployment'**, কিন্তু বেকার যে সে বেকারই, তাকে বিকৃত করে যাই বলা হোক না কেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত ম্যাগনাস পাইক (**Magnus Pyke**) বলেছেন :[৬] **'In the United States, where the progress**

towards 'automation' is further advanced than it is in Great Britain, the gradually increasing freedom from the need to do paid work is being call-d 'technological unemployment.' বিখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ফস্ ও সেপার্ড পরিষ্কার করে বলেছেন যে 'the rational meaning of the introduction of automatic machines in industry is that they lead to very substantial reductions in wages expenditure per unit of production.'[৭] অটোমেশনের ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক ইউনিটের মজুরি-খরচ যথেষ্ট কমে যায়। তাই যদি হয়, তাহলে কারখানা অটোমাইজড (automised) হলে কর্মীদের মজুরিও কমিয়ে দিতে হয়, অথবা তাদের কর্মচ্যুত করতে হয়। অটোমেশনের ফলে তাই হচ্ছে। ভূস্বর্গের বদলে ভূ-নরকের কুৎসিত পরিবেশে ক্রমে বেকার-জীবনের বিভীষিকা বাড়ছে এবং দুঃস্বপ্নের এক দৈত্যপুরী রচনা করছে অটোমেশন।[৮]

অতঃপর তাহলে উপায় কি ? ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পল আইনজিগ বলেন যে অটোমেশনজনিত বেকারসমস্যা একেবারে সমাধান করা সম্ভব হবে না, কারণ অটোমেশনের ফলে যে-সংখ্যক লোক বেকার হবে, অটোমেটিক যন্ত্র নির্মাণের কারখানায় তাদের সকলকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে না—'It would be unwise to overemphasize the unemployment potentials in these new industries and assume that their growth will be sufficient to take care of displacements in the older industries.[৯] সুতরাং বেকারদের জন্য আইনজিগ বিকল্পকর্মের যে প্রস্তাব করেছেন তা এই :

১. সবরকমের শিল্পীর কাজকর্মের চাহিদা বাড়বে। মানুষ শ্রমশিল্পের অপ্রীতিকর মেহনত থেকে মুক্তি পেয়ে কলাশিল্পের নিরলস চর্চায় আত্মনিয়োগ করবে।
২. শ্রমশিল্পের কারখানা থেকে যারা মুক্তি পাবে তারা কৃষিকর্ম করবে।
৩. মেয়েরা বাইরের কাজকর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে গৃহকর্মে মনোনিবেশ করতে পারবে।

আইনজিগের এই বিকল্প-সমাধান অনেকেরই হয়ত হাসির উদ্রেক করবে,

কিন্তু সমাধানের আর উপায়ই বা কি? আইনজিগের প্রস্তাব শুনে মনে হয়, ভবিষ্যতে আবার আমরা গরু চরাব, লাঙ্গল চষব, মেয়েরা রান্নাবান্না করবে এবং সকলে ছবি আঁকবে। সব কাজকর্মই হবে শখের ব্যাপার, প্রয়োজনের তাগিদে কেউ কিছু করবে না। কিন্তু সমাধান কি তাতেও হবে? সমাধানের সত্যিকার উপায় অবশ্যই সোশ্যালিজম, কিন্তু সে তো এখনও বুদ্ধিমান মানুষের কাছে আকাশকুসুম হয়ে আছে। সোশ্যালিজমের পরীক্ষা যে-সব দেশে আরম্ভ হয়েছে সেখানে যান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরীক্ষার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আটপৌরে জীবনের অর্থনৈতিক সমাধান হলেই মানুষের চিরকালের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এরকম ধারণা সোশ্যালিস্ট 'lotus-eater'-দের মধ্যে আজও অনেকের থাকলেও, ধারণাটা যে সত্য নয় তা যে-সব দেশে কিছুকাল ধরে সোশ্যালিজমের পরীক্ষা চলেছে, সেইসব দেশের রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য বিচারটা খোলা-চোখে করতে হবে। অন্ধ আদর্শবাদের ঠুলি পরে নয়। সোশ্যালিজমের লক্ষ্য হল, নতুন মানুষ ও নতুন সভ্যতা গড়ে তোলা, তার ভিত্তি আর্থিক না মানবিক, তা আজ প্রত্যেক সোশ্যালিস্ট আদর্শবাদীর গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সোশ্যালিজম মানুষের সামনে এক নতুন সভ্যতার স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। সেই সভ্যতায়, মানুষ আশা করেছিল, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক উৎপীড়ন, রাষ্ট্রিক একনায়কত্ব—এসব তো থাকবেই না, মানবিক সদ্‌গুণের পূর্ণ বিকাশ হবে, লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ ক্ষমতা-লোলুপতা ইত্যাদি মানব-সমাজ থেকে ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যাবে এবং মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার বিকাশের পথে কোথাও কোনো অন্তরায় থাকবে না। কিন্তু মানুষের এই স্বপ্ন ও প্রত্যাশা সার্থক হয়েছে কি? তার চেয়েও বড় কথা, সার্থক হবে কি কোনদিন?

এতবড় প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য আমাদের নেই। আমরা দেখেছি, সোশ্যালিজমের সংগ্রাম যান্ত্রিক টেকনোলজির সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগিতা চলেছে—শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক দেশের টেকনোলজির সঙ্গে, শ্রেষ্ঠ সমাজ-তান্ত্রিক দেশের টেকনোলজির। অর্থাৎ নিছক যন্ত্রের প্রতিযোগিতা। কিন্তু কথাটা তা ছিল না। অন্তত যখন সমাজতন্ত্রের রঙিন ফানুস পৃথিবীর সর্বস্বহারা অসহায় মানুষের সামনে ওড়ানো হয়েছিল। যন্ত্রের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন যে নেই

তা নয়, যথেষ্ট আছে। ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রতিযোগিতা করতে হলে, এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য আনতে হলে যন্ত্র ও টেকনিকের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে চলে না। তাদের সমকক্ষ তো হতেই হয়, ছাড়িয়ে যেতে পারলে আরও ভালো হয়। সোশ্যালিস্ট দেশের এ-উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু সোশ্যালিজমের মতো অত বড় একটা আদর্শ যদি কেবল যান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, পণ্যময়তা ও যন্ত্রময়তাই যদি তার ধর্ম হয়ে ওঠে, এবং সেই প্রচুর পণ্য ও বিরাট-বিরাট সব যন্ত্রের তলা দিয়ে যদি আসল মানুষ ড্রেনের আবর্জনার মতো ভেসে যায়, অথবা যদি তারা সেইসব 'ভিকোসাইক্লোমিটার' যন্ত্রের নাটবল্টু, শ্যাফট-হুইল কলকব্জায় পরিণত হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য সব বড়-বড় আদর্শের মতো, বাস্তব আচরণকালে সোশ্যালিজমেরও চরম বিকৃতি ঘটেছে বলে মনে করতে হবে।

কথা ছিল, ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে সোশ্যালিজমের সংগ্রাম হবে আদর্শের সংগ্রাম, নীতির সংগ্রাম, মানবতার সংগ্রাম, নতুন সমাজ-সভ্যতা গড়ার সংগ্রাম। কথা ছিল সাধারণ মানুষ অকুতোভয়ে তাদের জীবন বলিদান দেবে সেই মহান আদর্শের জন্যে। তারপর যখন বাস্তবে রূপায়িত হবে সেই আদর্শ তখন মানুষের জীবনধারণের গ্লানি আর থাকবে না, মানুষকে মানুষ আর শোষণ করবে না, ক্রীতদাসযুগের স্বেচ্ছাচারী প্রভুর মতো চাবুক মেরে শাসন করবে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য স্থাপিত হবে, যুগ-যুগান্তের পরাধীন মানুষ স্বাধীন হবে, মুষ্টিমেয় একদল মানুষ 'রাষ্ট্র' (state) নামক বিকট ভিকোসাইক্লোমিটার যন্ত্রের স্টিমরোলার সাধারণের বুকের উপর দিয়ে নির্বিবাদে চালাবে না, অর্থের পদমর্যাদার ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের লোভ মোহ মানুষের থাকবে না, মানুষের সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষের বিষ ধুয়ে মুছে যাবে, এবং প্রেম-ভালবাসা-মমতা-মানবতা ইত্যাদি যা ধনতান্ত্রিক সমাজের **cash-nexus**-এ আবদ্ধ হয়ে প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়েছে, সমাজতন্ত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে তা প্রাণময় মানবিক হয়ে উঠবে। কিন্তু এত কথার একটি কথাও কি সত্য হয়েছে? প্রায় অর্ধশতাব্দীর সোশ্যালিজমের পরীক্ষার পরে যে সমাজ ও সভ্যতার চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার নতুনত্ব কোথায়? আকাশ বিদীর্ণ করে মানুষের কত 'স্লোগান', কত লড়াইয়ের আওয়াজ, বুকফাটা আর্তনাদের মতো শহর-গ্রামের পথে-পথে ধ্বনিত হয়েছে, হাজার হাজার

'মাইকে' প্রতিধ্বনিত হয়ে কত ছোট-বড়-মাঝারি নেতার কত কোটি-কোটি গালভরা কথা ঘুমপাড়ানি গানের মতো সাধারণ মানুষকে স্বপ্নের কোলে ঘুম পাড়িয়েছে, উৎসাহিত করেছে তাদের দলে-দলে মৃত্যুবরণ করতে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা পেয়েছে কি? তারা পেয়েছে এমন একটি সমাজ যেখানে বড় বড় যন্ত্র চলছে, বিকটাকার সব মহাযন্ত্র, অটোমেটিক যন্ত্র, যেখানে স্পুৎনিক উড়ছে চন্দ্রলোকে—কিন্তু যেখানে মানুষের সনাতন শঠতা দীনতা ও ক্ষমতালোলুপতার খেলা শেষ হয়নি, যেখানে নিষ্ঠুরতা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে স্পুৎনিকের মতো, যেখানে অটোমেটিক যন্ত্রের মতো দেবতুল্য নেতারা রাতারাতি দানবতুল্য হয়ে যায় এবং কালকের নরকের কীট আজকেই চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রার ঢেউয়ে হেলে-দুলে চলে বেড়ায়, যেখানে বন্দী মানুষের লক্ষ বছরের স্বপ্ন, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি স্ফূর্তির স্বপ্ন ধুলায় লুণ্ঠিত হয়েছে, এবং যেখানে ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সর্বাত্মক মারণাস্ত্রের ও অটোমেটিক যন্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে সমাজতন্ত্রের নামে। জীবনের কি আছে সেখানে? ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পিতার সঙ্গে পুত্রের, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সমস্ত স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সেখানে। এবং সকলেই রাষ্ট্রযন্ত্র ও পার্টিযন্ত্রের গুপ্তচর হয়ে এক অভিশপ্ত চক্রান্তের পাতালপুরীতে বাস করছে। শিল্পী পাস্তেরনাক (Boris Pasternak) তাই ডক্টর জিভাগো উপন্যাসে লারার মুখ দিয়ে বলেছেন:[১]

'The whole human way of life has been destroyed and ruined. All that's left is the naked human soul stripped to the last shred....You and I are like Adam and Eve, the first two people who at the beginning of the world had nothing to cover themselves with .. and now at the end of it we are just as naked and homeless.' এত স্লোগান, এত মেঠো বক্তৃতা, এত বেতার-প্রেসের প্রচার ও পোস্টার, গোল-গাল নাদুস-নুদুস মোলায়েম বুলির এত বিপুল বন্যা, এত শহীদের শোণিতসমুদ্র, এত স্ট্যাটিস্‌টিক্সের ভেল্‌কি, এত 'ইডিওলজি'র অ্যালকোহল পানের পর, রাম-রাবণের এত প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে—অবসন্ন মানুষ চোখ মেলে দেখছে যে আজও সে সোনালী আদর্শের স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করছে, সমাজের দুশমন রাবণদের বধ

করা সম্ভব হয়নি, এবং সাম্যের রামরাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার সমস্যা আদিকালেও যা ছিল আজও তা-ই আছে, কেবল তার বাইরের আবরণটা বদলেছে মাত্র। সোশ্যালিস্ট দেশেও আমরা অটোমেটিক যন্ত্রপুরী প্রতিষ্ঠা করেছি, ঠিক ধনতান্ত্রিক দেশের মতো। মানুষের মন একইঞ্চিও উন্নত হয়নি। মানুষের বোধশক্তি এক কাঁচ্চাও বাড়েনি। মানুষের 'মনুষ্যত্ব' চূর্ণ করে দিয়েছে অটোমেটিক যন্ত্র এবং তার প্রতিরূপ পলিটিক্যাল পার্টি, বাকি আমরা সকলে ফাঁপা মানুষ—'hollow men'—

> Our dried voices, when
> We whisper together
> Are quiet and meaningless
>
> *T. S. Eliot*

আমরা সব ধুঁকছি, আর বেঁচে আছি, মরতে মরতেও বলছি বাঁচতে চাই, কিন্তু বাঁচছি কই! মরছি ক্যান্সারে আর কার্ডিয়াক হেমারেজে—স্লোগানের ক্যাপসুলে মোড়া বড়-বড় সব আদর্শ চর্বিতচর্বণ করছি—আর ধুঁকছি। ডক্টর জিভাগোর সমস্ত উক্তির মধ্যে, আমার মনেহয় সবচেয়ে স্মরণীয় হল এইটি

> Microscopic forms of cardiac hemorrhages have become very frequent in recent years. They are not always fatal. Some people get over them. It's a typical modern disease. I think its cause are of a moral order. The great majority of us are required to lead a life of constant, systematic duplicity. Your health is bound to be affected if, day after day, you say the opposite of what you feel, if you grovel before what you dislike and rejoice at what brings you nothing but misfortune. Our nervous system isn't just a fiction, it's part of our physical body ; and our soul exists in space and is inside us, like the teeth in our mouth It can't be violated with impunity.
>
> *Dr. Zhivago P. 483*

'সম্প্রতি 'কার্ডিয়াক হেমারেজ' মানুষের একটা সাধারণ ব্যাধি হয়েছে। সব সময় তা হয়ত ভয়াবহ হয় না। অনেকে তার আঘাত এক-আধবার সামলেও ওঠে। *এটি একটি টিপিকাল* আধুনিক ব্যাধি। কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাধির কারণ হল নৈতিক কারণ। আজকাল সর্বদাই আমরা একটা কৃত্রিম দ্বৈত-জীবন যাপন করতে বাধ্য হই। সমাজের অবস্থা যদি এরকম হয় যে দিনের-পর-দিন আমরা যা অনুভব করি *ঠিক* তার বিপরীত কাজ করতে বাধ্য হই, যদি আমাদের ঘৃণ্য বস্তুর সামনে প্রতিদিন নতজানু হয়ে চলতে আমরা বাধ্য হই এবং যা নিশ্চিত আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করি, তাহলে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য কখনই *ঠিক* থাকতে পারে না। দেহের খাঁচার মধ্যেই মনের বসতি, এবং আমাদের স্নায়ুতন্ত্রটা একটা কাল্পনিক পদার্থ নয়, মুখের ভিতরে যেমন দাঁত থাকে, দেহের ভিতরে তেমনি থাকে আত্মা। খুশিমনে কারও ওপর নির্যাতন করা যায় না।'

শিল্পী পাস্তেরনাকের এই উক্তির মধ্যে অটোমেটিক যান্ত্রিক সমাজের শোচনীয় পরিণতির করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্তমান সমাজে মানুষের সতত দ্বৈত-জীবন যাপনের যন্ত্রণার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই দ্বিখণ্ডিত সত্তার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের দেহ ও মন দুই-ই তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তবু মানবের ছদ্মবেশী যন্ত্র-যুগের সর্বশক্তিমান দানবেরা সাধারণ মানুষকে অনবরত ঘুমপাড়ানি গান শোনাচ্ছে—স্বর্ণকান্তি সামাজিক আদর্শের ঘুমপাড়ানি গান। তাহলে আমরা চলেছি কোথায় এবং অটোমেশনের যুগের শেষই বা কোথায়?

গণতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র কিছুই নয়, রাজনৈতিক মন্ত্রে কোনো রামতন্ত্রই ভূমিষ্ঠ হবে না। যা হবে এবং যেটুকু হবে যন্ত্রের কৃপায়, বিশেষ করে অটোমেটিক যন্ত্রের অনিরুদ্ধ অভিযানের ফলে। অটোমেশন আর যাই করুক বা না-করুক, ধনতন্ত্রের বিশাল স্কাইস্ক্রেপার নিশ্চিত ভূমিসাৎ করে দেবে। অটোমেশনের ধ্বংসাভিযান কোনো মন্ত্রের বলে ধনতন্ত্র প্রতিরোধ করতে পারবে না। অটোমেটিক যন্ত্রের জয় ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ে পরিণত হবে। কিন্তু ধনতন্ত্রের সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন কোন্ 'তন্ত্র' গড়ে উঠবে? আপাতত তো মনে হয় 'ধনতন্ত্র' বা অটোমেটিজম। সাম্য ও সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন মানুষ চিরকাল দেখবে, কিন্তু আজকের রঙ্গমঞ্চে তার ব্যঙ্গাভিনয় দেখে মনে হয়, স্বপ্ন সহজে

বাস্তবে পরিণত হবে না।

এর মধ্যে যন্ত্রতন্ত্রের জয় হবে। অটোমেটিক যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে চাহিদাতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন করবে। অটোমেটিক যন্ত্রের মতো মানুষও ভোজন-রমণ-মরণের চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন করবে। যন্ত্রের বন্যায় অনর্গল জনসংখ্যা বাড়বে, যন্ত্র বাড়বে, পণ্য বাড়বে, এবং সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে সমাজ হবে যন্ত্রের প্রতিবিম্ব। প্রেম-ভালোবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতা-দয়া-উদারতা-ক্ষমা-করুণা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি অটোমেটিক ভোজন-রমণ যন্ত্রের চক্রে চূর্ণ হয়ে যাবে। অটোমেশনের যুগে মানুষ হবে **'outsider'**—নিজের সমাজে, নিজের পরিবারে ও জীবনে অজ্ঞাতকুলশীলের মতো। আলবেয়র কামুর **(Albert Camus)** বিখ্যাত নায়ক ম্যরসোর **(Méursault)** মতো মায়ের মৃত্যুর কথা সে যন্ত্রের মতো বর্ণনা করবে: **'Mother died to-day. Or may be yesterday. I can't be sure'**—ঠিক যন্ত্রের মতোই নির্মম উদাসীন—'মা আজ মারা গেছেন। কালও হতে পারে। ঠিক জানি না।' হেমিঙওয়েয়র **(Ernest Hemingway)** একটি গল্পের নায়ক **(Soldiers Home)** ক্রেবস-এর সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথন হচ্ছে এইভাবে

মা: 'তুই কি আমাকে একটুও ভালোবাসিস না, ক্রেবস?'

ক্রেবস: 'না।'

মা একবার টেবিলের ওপরে ছেলের মুখের দিকে চাইলেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরতে লাগল। ক্রেবস বলল: 'শুধু তোমাকে নয়, আমি তো কাউকেই ভালোবাসি না মা!'

মা যখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'আমি তোর মা, তোকে পেটে ধরেছি, বুকে করে মানুষ করেছি—' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

ক্রেবস অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, মায়ের কান্না দেখে তার মনে হল যেন তার গা বমি-বমি করছে।

ক্রেবস ও ম্যরসোর অটোমেটিক সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।

অবশেষে খুনী ম্যরসোর বিচার হচ্ছে যখন আদালতে তখন প্রসিকিউটর জুরীদের আহ্বান করে বললেন: **'Gentlemen of the jury, I would like you to note that, on the day after his mother's funeral, that man was visiting a swimming pool, starting a liason**

with a girl and going to see a comic film.' জুরীর বেঞ্চে আমরা ক্যাপিটালিস্ট ও সোশ্যালিস্ট উভয় দেশের সমাজনেতাদের বসিয়ে, মানুষ সম্বন্ধে এই অভিযোগ করতে পারি। ট্র্যাজেডি সেইখানে। ধনতান্ত্রিক সমাজের যান্ত্রিকতা ও নির্মম হৃদয়হীনতা সমাজতান্ত্রিক সমাজের পাঁজর পর্যন্ত জর্জরিত করেছে। যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় দুই সমাজের মানুষই অমানুষ ও যান্ত্রিক হয়ে গেছে। সবার উপরে অটোমেটিক যন্ত্র, টেকনিক ও চতুর স্ট্যাটিস্টিক্স হয়েছে সবচেয়ে বড় সত্য। ছাপাখানা-রেডিও-টেলিভিসনের মহাযন্ত্রের জাদুতে আজকের সত্য কাল মিথ্যা হচ্ছে। কালকের মিথ্যা হচ্ছে পরশুর চরম সত্য।

অটোমেটিক যন্ত্রযুগের জীবনশিল্পীরা তাই বর্তমান সমাজের যান্ত্রিক মানুষের ভয়াবহ চিত্র তাঁদের সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। অপরাধ শিল্পীদের নয়। এই যান্ত্রিক সমাজ মহা-উৎসাহে যাঁরা গড়ে তুলেছেন—সমস্ত মানবিক অনুভূতি, বোধ ও মহৎগুণকে পদদলিত করে—অপরাধ তাঁদের। শিল্পীদের নির্দোষ মাথার উপর রাজনৈতিক কটূক্তি বর্ষণ করা বৃথা। ভিকোসাইক্লোমিটারতন্ত্রের মতো সমাজে, ভোজন-রমণ-মরণের চক্রে ঘূর্ণ্যমান মানুষের অটোমেটিক জীবন যতদিন না শেষ হবে, ততদিন এই অভিশম্পাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। ততদিন—ততদিন কেবল ওই 'পাতলুন আঁটলুম, বড়লোক চাটলুম', আর মধ্যে-মধ্যে নেশাখোরের মতো প্রশ্ন—'জীবনটা কী!' অটোমেটিক যন্ত্রের ঘূর্ণনের শব্দ, 'খাড়া বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি-খাড়া !!!'

১৩৬৫ | ১৯৫৮

---

১ Calling All Jobs : Introduction to the Automatic Machine Age : New York, November 1956

২ International Labour Organisation : 89 Session Report, 1956

৪ Norbert Weiner ; The Human Use Human Beings : London 1954, p. 162

৪ S. Lilley : Automation and Social Progress, London 1957, p. 117

৫ The Challenge of Automation : Paper delivered at the National Conference on Automation : Washington, 1955

৬ Magnus Pyke : Automation, its Purpose and Future : London 1956 p. 179

৭ W. A. Faunce and H. L. Sheppard : Automation, Some Implications for Industrial Relations : Transactions of the Third World Congress of Sociology. Vol-1, Part 1, 1956 ; p. 167

৮ Automation and Technoiogical Change : Hearings before Sub-Committee on Economic Stabilisation etc: Washington, 1955

৯ Paul Einzig : The Economic Consequences of Automation : London 1957 pp, 58–60

১০ Boris Pasternak ; Dr. Zhivago : translated by Max Hayword and Manya Harari : 19 8 pp. 402-3

সমাজবিজ্ঞানীর এ কোন শোচনীয় পরিণতি !

'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর কমিউনিস্টমহলে (তখন অবিভক্ত) বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কুড়িবছর আগেকার কথা। কবি গোলাম কুদ্দুস সাহেব কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লেখেন (রবিবার, ১ চৈত্র ১৩৬৫)। কালের ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে গুরুত্ব আছে মনে করে প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল।

—বি. ঘো

সমাজবিজ্ঞানী শ্রীবিনয় ঘোষ 'শনিবারের চিঠিতে' 'অটোমেটিক জীবন ও সমাজ' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই দৃষ্টি আকর্ষণের প্রধান কারণ, শ্রীযুক্ত ঘোষকে লোকে ইতিপূর্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থক হিসাবে জানত, কিন্তু এই প্রবন্ধে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তিনি তার প্রকাশ্য বিরোধিতার কথা জানিয়েছেন। এবং এই জানানোর মধ্যে তিনি বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেননি। এক দিক দিয়ে এ তিনি ভালোই করেছেন। কেননা তিনি যে তাঁর এতদিনের পথ পরিবর্তন করেছেন সে সম্পর্কে অতঃপর লোকের মনেও কোনো অস্পষ্টতা থাকবে না।

একজন সমাজবিজ্ঞানীর মনে অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং জীবন ও সমাজে তার প্রভাব সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা জাগা খুবই স্বাভাবিক। আজ যখন যন্ত্রযুগের নতুন এক পর্যায়ের সূচনা হচ্ছে তখন এই রকম অনুসন্ধিৎসা সমাজ-বিজ্ঞানীদের মনে না জাগলেই বরং অস্বাভাবিক হত। আর সাধারণ মানুষও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নতুন যন্ত্রযুগের তাৎপর্যের গভীর ব্যাখ্যাই আশা করে।

কিন্তু শ্রীবিনয় ঘোষ কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ? তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে :

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানুষকে যন্ত্রের ক্রীড়নকে পরিণত করেছে। ফলে মানুষের বুদ্ধির ভিৎ পর্যন্ত আজ কেঁপে উঠেছে। ধনতান্ত্রিক জগতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র একদিকে বিরাট সংখ্যক মানুষকে বেকার করে এবং অন্যদিকে বিপুল পণ্য সৃষ্টির দ্বারা বাজারের সংকট সৃষ্টি করে আজ এক অন্ধগলিতে প্রবেশ করেছে। এর একমাত্র

সমাধান ছিল সমাজতন্ত্র। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও যন্ত্রের খপ্পরে পড়েছে। সেখানে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম যান্ত্রিক উৎকর্ষ সাধনের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। কাজেই সমাজতান্ত্রিক দেশেও মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সেখানকার পার্টিও যন্ত্রেরই এক প্রতিচ্ছবি। সেই পার্টিযন্ত্রের নাট-বল্টুতে পরিণত হয়েছে মানুষ। অটোমেটিক যুগে মানুষ হবে outsider—নিজের সমাজে নিজের পরিবারে ও জীবনে অজ্ঞাতকুলশীলের মত।

এই ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানের আশ্রয় না নিলেও চলত। বরং অজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করলেই ভালো হত। কারণ যন্ত্রযুগের ইতিহাসের একটা অতি মামুলি ঘটনা হল এই যে, ইংলণ্ডে যন্ত্রযুগের প্রথম দিকে অতি নিষ্পেষিত অজ্ঞ শ্রমিকদেরও ধারণা হয়েছিল, যন্ত্রই যত নষ্টের গোড়া। তারা দলবেঁধে যন্ত্র ভাঙতে গিয়েছিল। আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল বহু কারখানায়। তারপর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মোটামুটি বুঝতে স্বরু করে, বঞ্চনার জন্য যন্ত্র দায়ী নয়, দায়ী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং মালিকশ্রেণী। আর প্রতিকারের উপায় তাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম। এই যন্ত্রকেই একবার যদি মুনাফা শিকারের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে পারা যায় তাহলে সে হবে মানুষের পরম আজ্ঞাবহ দাস। তখন যন্ত্রের যতই উন্নতিবিধান হবে মানুষের হাডভাঙ্গা খাটুনিও ততই কমবে, আয়ও ততই বাড়বে, অবসরও মিলবে ততই বেশী এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বযোগও স্বষ্টি হবে সেই অনুপাতে। আজ সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আমরা সেই প্রক্রিয়াই দেখতে পাচ্ছি। যন্ত্রের উৎকর্ষের মাধ্যমে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি সেখানে যতই বাড়ছে ততই একদিকে জীবিকার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে সেখানে কমিউনিজমের বৈষয়িক ভিত্তি তৈরী হচ্ছে। এত অদূর ভবিষ্যতে মানুষ সেখানে ইচ্ছামত খাটবে, প্রয়োজন মত জিনিসপত্র পাবে। মানুষের সেই পরম মুক্তির দিন আজ আর সোবিয়েৎ ইউনিয়নে শুধু আরাধ্য বস্তু নয়, আজ সপ্তবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

এই অবস্থায় একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে শ্রীবিনয় ঘোষের কি উচিত ছিল না মানুষের এই পরম মঙ্গলময় জয়যাত্রাকে স্বাগত করা? তাঁর কি কর্তব্য ছিল না সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞান এবং যন্ত্রের অগ্রগতির দ্বারা মানবতাবিরোধী মুনাফাশিকারী সাম্রাজ্যবাদীদের চরম পতনের দিন কী ভাবে ঘনিয়ে আসছে তা ব্যাখ্যা করা? কিন্তু তিনি উল্টে দেখছেন, 'প্রতিযোগিতা চলেছে শ্রেষ্ঠ

ধনতান্ত্রিক দেশের টেকনোলজির সঙ্গে শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশের টেকনোলজির। অর্থাৎ নিছক যন্ত্রের প্রতিযোগিতা।'

প্রতিযোগিতাটা যে নিছক যন্ত্রে যন্ত্রে নয়, প্রতিযোগিতা যে চলেছে দুই সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে, তা আজকাল প্রতিপক্ষের অনেক লোকের পর্যন্ত চোখ এড়ায় না। অথচ বিনয়বাবুর মত সমাজবিজ্ঞানীর চোখে পড়ছে না, এটাই আশ্চর্য। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অবশ্য বিনয়বাবু বলতে পারেন, আমি তো ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষও সমর্থন করিনি, আমি তো দুই পক্ষকেই যন্ত্র-সর্বস্বতার জন্য গালাগালি দিয়েছি! ·মন কি আমি একথাও বলেছি যে, অটোমেটিক যন্ত্রের কল্যাণেই ধনতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী! সেই সঙ্গে শুধু আমি এইটুকু মাত্র বলতে চেয়েছি যে সমাজতন্ত্রের রাজত্বেও মানুষের বদলে শাসন করবে যন্ত্র। এবং মানুষ নিজেই পরিণত হবে অটোমেটিক যন্ত্রে! অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের সংগ্রামেও মানুষের প্রকৃত মুক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত সব ঝুটা হ্যায়। এত বড় সিনিসিজম্ এবং মানব বিদ্বেষ কি কল্পনা করা যায়!

বিনয়বাবুর মত সমাজবিজ্ঞানীর জানা আছে কিনা জানি না, আজকের জগতে যখন সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা উদ্দাম হয়ে উঠেছে তখন সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকেরাও অনেক সময় সরাসরি তার বিরুদ্ধতা করে তেমন ফল পাচ্ছে না। তাদেরও ঘুরিয়ে কথা বলতে হচ্ছে, প্রচার চালাতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণে'র পাগলা মেহের আলীর মত তাদেরও মাঝে মাঝে চিৎকার করতে হচ্ছে 'সব ঝুটা হ্যায়'

সবই যদি ঝুটা হয় তাহলে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে আর কি এমন লাভ! পাগলা মেহের আলীর কাছে যা ছিল পাগলামী, ধনতন্ত্রের স্তাবকদের কাছে তা কূটকৌশল।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজবিজ্ঞানী বিনয়বাবু হয়ত এ কথাও ভুলে গেছেন যে, অটোমেটিক যন্ত্রের কল্যাণেই ধনতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে রূপান্তর হয়না। রূপান্তরের প্রধান হাতিয়ার শ্রেণী-সংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি। অটোমেটিক যন্ত্রযুগের বহু আগেই বহুদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিনয়বাবুর প্রচারকৌশল তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকেই ধরা পড়বে:

'ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সর্বাত্মক মারণাস্ত্রের ও অটোমেটিক যন্ত্রের প্রতিযোগিতা চলেছে সমাজতন্ত্রের নামে।'

তাঁর একবারও মনে হল না মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কী আপ্রাণ চেষ্টাই না চলেছে। তাঁর একবারও মনে হল না যেখানে ধনতন্ত্র নেই, মুনাফার প্রশ্ন নেই এবং বাজারের সমস্যা নেই সেখানে মারণাস্ত্রের এবং যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয় না। তিনি একবারও ভেবে দেখলেন না সোবিয়েৎ ইউনিয়নের হাতে পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন অস্ত্র এবং আন্ত-মহাদেশীয় রকেট আজ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের সংযত হতে বাধ্য করেছে। তাঁর কাছে যুদ্ধাস্ত্র যার হাতেই থাকুক, সেটা তুল্যমূল্য। এই রকম অন্ধতা কি মানবতার পরিপোষক? অথবা, এই অন্ধতা স্বেচ্ছাকৃত?

আমি জানি হাঙ্গেরী, স্তালিন প্রভৃতি ঘটনা নিয়ে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কারো কারো মনে নানা ব্যাপারে কিছু সন্দেহ এবং দ্বিধার সৃষ্টি হয়। সেটা কতটা সঙ্গত বা অসঙ্গত সে বিচার এখানে করতে বসিনি। কিন্তু এও জানি সোবিয়েৎ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতামূলক মনোভাব প্রকাশ বা নগ্ন কুৎসা প্রচার, আর ঐসব দেশের নানা প্রশ্নে মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, এ'দুয়ের মধ্যেকার পার্থক্য অনেকখানি। কিন্তু বিনয়বাবুর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল, তাঁর মনে সকল দ্বিধাদ্বন্দ্বের নিরসন ঘটেছে, তিনি আর সন্দেহের দোলায় দুলছেন না, তিনি ভেবে চিন্তে এখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছেছেন।

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন সম্পর্কে তিনি অতি স্বচ্ছন্দে লিখছেন, 'জীবনের কি আছে সেখানে? ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পিতার সঙ্গে পুত্রের, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সমস্ত স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সেখানে এবং সকলেই রাষ্ট্রযন্ত্র এবং পার্টিযন্ত্রের গুপ্তচর হয়ে এক অভিশপ্ত চক্রান্তের পাতালপুরীতে বাস করছেন।'

বিনয়বাবু যাকে বলে Categorical বা স্থির নিশ্চয়, তাই হয়েছেন। তিনি একটা 'পজিশন' নিয়েছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি গভীর শত্রুতা-মূলক আচরণের ইচ্ছা থাকলেই তবে এ রকম ভাষা কেউ প্রয়োগ করতে পারেন। কারণ আমরা যারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছি, তারাও কেউ কখনো বলি না এই নিষ্ঠুর বর্বর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও 'স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পিতার সঙ্গে পুত্রের, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সমস্ত স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।' সমস্ত স্বাভাবিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলে সমাজ কখনো সমাজ থাকে না। বুর্জোয়ারা সমস্ত মানবিক

সম্পর্ককে 'টাকার সম্বন্ধ বা cash nexus-এ দাঁড় করায়। তবু মানুষের গৌরব এই যে, এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও মানবিক সম্পর্ক নিঃশেষ হতে চায় না, মানুষ একে অন্যের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। আর মানুষের সচেতন অংশের মধ্যে এই মানবধর্মই শ্রেণীসংগ্রামের রূপ নেয়। অবশেষে একদিন এই মানবিক সম্পর্কই এমন শক্তি সঞ্চয় করে যে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সে চরম আঘাত হানে। মানবতা যেখানে ধুল্যবলুণ্ঠিত সেই বুর্জোয়া সমাজেও মানবিক সম্পর্কের রূপ যদি এই হয় তাহ'লে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার কী উজ্জ্বল মহান রূপ উদ্ভাসিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী তা সহজেই অনুমেয়। অথচ আমাদের সমাজবিজ্ঞানীর ধারণা কি? সমাজতান্ত্রিক দেশ—যেখানে শোষণ নেই, প্রতিযোগিতা নেই; মুনাফার বেদীতলে মানবতাকে প্রতিদিন বলি দিতে হয় না এবং যেখানে জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন মানুষকে অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করতেও হয় না, সেখানে 'সকল মানবিক সম্পর্ক 'ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে' এবং সকলে 'অভিশপ্ত চক্রান্তের পাতালপুরীতে বাস করছে।' এই কথা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে! একজন সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে এই অপচেষ্টা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি কঠোর শত্রুতাসাধন ছাড়া আর কি? কিন্তু মজার ব্যাপার, আমাদের এই সমাজ-বিজ্ঞানী সোবিয়েৎ পারিবারিক জীবনের এই ভাঙ্গনের চিত্র সংগ্রহ করেছেন 'ডাঃ জিভাগো' নামক উপন্যাস থেকে। আমাদের স্বদেশের এবং অন্যান্য দেশের বহু খ্যাত ও অখ্যাত মানুষ সোবিয়েৎ ভ্রমণ করেছেন, তাঁদের তথ্যাদির উপর ভিত্তি করলে হয়ত সমাজবিজ্ঞানের কিছুটা সধর্মরক্ষা করা হত এবং ইজ্জতও বাঁচত। কিন্তু আমাদের এই সমাজবিজ্ঞানীর শক্ত খুঁটি হচ্ছে একখানা কল্পনামূলক রচনা—আবার সেটিও সোবিয়েৎ সমাজ-ব্যবস্থা-বিরোধী মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন একজন শিল্পীর ব্যর্থ মনের কল্পনা।

আমাদের এই সমাজবিজ্ঞানীর কি অজানা আছে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কোনো পরিবারে শিশু জন্মালে তার দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করে এবং বহু শিশু জন্মালে সেই অনুসারে ভাতাও বেশী বাড়ে, এমনকি বহু সন্তানের জননীকে 'বীর প্রসবিনী' উপাধি এবং অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়? তাঁর কি এটাও জানা নেই যে, সেখানে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের প্রত্যেকের জন্য পেনসনের ব্যবস্থা আছে এবং সাতসালা পরিকল্পনায় এই হার মাথা পিছু এক'শ থেকে দেড়'শ রুবল আরো বাড়ানোর আয়োজন হচ্ছে? শিশু এবং বৃদ্ধের এমন ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক

দেশের কোথায় আছে ? যেখানে বাড়ীতে বেকার ভাই বসে থাকে না, যেখানে স্বামী-স্ত্রী সংসারে আয় এবং ব্যয়ের অধিকার সমান ভাবে বহন করে, শিশু এবং বৃদ্ধের ভার যেখানে রাষ্ট্র নিয়েছে, লোভ এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে পারিবারিক ভাঙ্গন না আসাই তো স্বাভাবিক। সম্প্রতিকালে অত্যন্ত কমিউনিস্ট-বিরোধী মানুষও যারা সোবিয়েৎ ভ্রমণ করে এসেছেন তাঁরাও কেউই এ কথা বলেননি যে, সোবিয়েৎ পরিবারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। বরং অনেকে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন যে, পারিবারিক সম্পর্ক সেখানে আরো উন্নত স্তরে পৌঁচেছে। একমাত্র মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডালেস এবং এঁর সমগোত্রীয়ের লোক ছাড়া সোবিয়েৎ পারিবারিক জীবনের এই কুৎসা প্রচার কারো মুখে শুনিনি। সমাজবিজ্ঞানী হয়ে কি বিনয়বাবুর উচিত তাঁদের ভাষ্যকেই নিজের ভাষ্য বলে প্রচার করা ? তাঁর কি বোঝা উচিত ছিল না, শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক সমাজেও দুই একটা ভালো জিনিস ঘটতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক কদযতা ঢাকা পড়ে না, ঠিক তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও দুই একটা খারাপ জিনিস ঘটতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে সে-সমাজের সামগ্রিক মানবিকতার চিত্র দেখতে না পাওয়া অবৈজ্ঞানিক। বরং যতই দিন যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বর্বর অতীতের রেশ ততই কাটিয়ে উঠছে। আর ধনতান্ত্রিক সমাজ যতই দিন যাচ্ছে ততই আরো গ্লানি এবং কদর্যতায় ভ'রে উঠছে। নিজের দেশ ভারতের চিত্র সামনে রেখেও একজন সমাজবিজ্ঞানীর কি এই সত্য অনুধাবন করতে পারা উচিত ছিল না ?

অথচ কী গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গেই না আমাদের এই সমাজবিজ্ঞানী সোবিয়েতের কুৎসায় মেতেছেন। কী রকম অবিশ্বাস্য অসত্যের বিষবাষ্প তিনি ছড়িয়েছেন লক্ষ্য করুন :

'প্রায় অর্ধশতাব্দীর সোশ্যালিজমের পরীক্ষার পরে যে সমাজ ও সভ্যতার চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার নতুনত্ব কোথায় ? আকাশ বিদীর্ণ করে মানুষের কত শ্লোগান, কত লড়াইয়ের আওয়াজ, বুকফাটা আওয়াজের মতো শহরে বাজারে ধ্বনিত হয়েছে, হাজার হাজার 'মাইকে' প্রতিধ্বনিত হয়ে কত ছোট বড় মাঝারি নেতার কত কোটী কোটী গালভরা কথা ঘুমপাড়ানি গানের মতো সাধারণ মানুষকে স্বপ্নের কোলে ঘুম পাড়িয়েছে, উৎসাহিত করেছে তাদের দলে দলে মৃত্যু বরণ করতে। কিন্তু তার বিনিময়ে তারা পেয়েছে কি ? তারা পেয়েছে এমন

একটা সমাজ যেখানে বড় বড় যন্ত্র চলছে, বিকটাকার সব মহাযন্ত্র, অটোমেটিক যন্ত্র, যেখানে স্পুৎনিক উড়ছে চন্দ্রলোকে—কিন্তু যেখানে মানুষের সনাতন শঠতা, দীনতা ও লোলুপতার খেলা শেষ হয়নি, যেখানে নিষ্ঠুরতা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে স্পুৎনিকের মতো, যেখানে অটোমেটিক যন্ত্রের মতো দেবতুল্য নেতারা রাতারাতি দানবতুল্য হয়ে যায় এবং কালকের নরকের কীট আজকেই চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রার ঢেউয়ে হেলে-দুলে চলে বেড়ায়, যেখানে বন্দী মানুষের লক্ষ বছরের স্বপ্ন, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বাকশক্তি স্ফূর্তির স্বপ্ন ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে·· '

সমাজবিজ্ঞানী বিনয়বাবুর নামের মধ্যে বিনয় থাকলেও ভাষার মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। স্তালিনের শেষ জীবনের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির সমালোচনা দেখেই বোধ হয় তিনি বৈজ্ঞানিক স্থৈর্য হারিয়ে বলছেন, 'দেবতুল্য নেতারা রাতারাতি দানবতুল্য হয়ে যায়।' কিন্তু 'কালকের নরকের কীট' তিনি কাকে বলছেন এবং কেন বলছেন? নিছক বল্গাহীন উষ্মা প্রকাশ ছাড়া একে কী বলব? সমাজবিজ্ঞানীর ভাষা একটু সংযত হবে বলেই তো লোকে আশা করে। অথচ বিনয়বাবু কি পরিমাণে ক্ষেপে গেছেন দেখুন: 'এত শ্লোগান, এত মেঠো বক্তৃতা, এত বেতার-প্রেসের প্রচার ও পোস্টার, গোলগাল নাদুসনুদুস মোলায়েম বুলির এত বিপুল বন্যা, এত শহীদের শোণিত সমুদ্র, এত স্ট্যাটিসটিকসের ভেলকি, এত 'ইডিওলজির' অ্যালকোহল পানের পর, রাম-রাবণের এত প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে —অবসন্ন মানুষ চোখ মেলে দেখছে যে আজও সে সোনালী আদর্শের স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন করছে, সমাজের দুশমন্ রাবণদের বধ করা সম্ভব হয়নি, এবং সাম্যের রামরাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার সমস্যা আদিকালে যা ছিল, আজও তাই আছে, কেবল তার বাইরের আবরণটা বদলেছে মাত্র।'

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, একজন সমাজবিজ্ঞানীর মুখে শুনতে হল, 'মানুষের সমস্যা আদিকালে যা ছিল এখনো তাই আছে।' আমরা এতদিন জানতাম পরিবর্তনশীল কাল এবং পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াকর্ম এবং সমাজকে বিচার করাই সমাজবিজ্ঞানের একটা মূল আদর্শ এবং পদ্ধতি। কিন্তু এখন দেখছি 'মানুষের সমস্যা আদিকালে যা ছিল এখনো তাই আছে।' এ তো শুধু বিপ্লবী মনোভাব পরিত্যাগ নয়, প্রকৃতি ও সমাজ বিচারের ডারউইন প্রবর্তিত ক্রমবিকাশের তত্ত্বকেও পরিহার। মনে হচ্ছে, আমাদের সমাজবিজ্ঞানীর

কাছে সবই—অনড়, অচল। চরম পরিহাসের কথা এই যে, চার্লস ডারউইনের শতবার্ষিকী মাত্র কিছুদিন আগে সারা পৃথিবীতে পালিত হয়েছে। বৃদ্ধ আজ কবর থেকে উঠে এলে তরুণ সমাজবিজ্ঞানীকে কি বলতেন? আমাদের এই সমাজবিজ্ঞানী আর এক জায়গায় লিখছেন, 'মানুষের মন এক ইঞ্চিও উন্নত হয়নি, মানুষের বোধশক্তি এক কাঁচ্চাও বাড়েনি।' কিংবা আরো এক জায়গায় এই সমাজবিজ্ঞানী বলেছেন, 'অপরাধটা বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞানীর নয়, যন্ত্রের নয়, যন্ত্রীরও নয়—অপরাধ মানুষের স্বভাবের ও প্রকৃতির। সমস্যা বিজ্ঞান বা যন্ত্রের নয়—সনাতন মানুষের।'

আমাদের এই সমাজবিজ্ঞানী 'সনাতন মানুষে' যখন পৌঁছে গেছেন তখন তিনি প্রায় ক্যাথলিক ধর্মের 'আদিম পাপে'র সন্ধানে বেরিয়েছেন মনে হয়। একে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের চেয়ে ধর্মীয় মনোভাব বলাই বেশী সমীচীন।

শ্রীবিনয় ঘোষ একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি গ্রহণ করলেই দেখতে পেতেন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সপ্ত বার্ষিকী পরিকল্পনার যান্ত্রিক অগ্রগতির কী গভীর মানবিক তাৎপর্য। আমাদের ভারতের মতো অনুন্নত দেশের কথাই ধরা যাক। সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে যন্ত্রবিপ্লবে বাধা দিয়ে কত মহামারী দুর্ভিক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং অজ্ঞতা চিরস্থায়ী করে রাখতে চেষ্টা করেছে তা কি আমাদের অজানা? আজো ভারতকে কাঁচামালের বাজারে পরিণত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা কি লোপ পেয়েছে? কত বাধা ঠেলে ঠেলে একটু একটু করে শিল্পোন্নতি আমরা করেছি তার ইতিহাস আমাদের কাছে একেবারেই চলতি ইতিহাস। আর আজ এও আমরা দেখছি যে, সমাজতন্ত্রের পথে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পূর্ণ সহযোগিতাতেই একমাত্র আমরা ভারতে দ্রুত অগ্রসর হতে পারি। ভারতে আজ যে মনুষ্যত্ব বিফল প্রয়াসের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে তারও পূর্ণ বিকাশের পথ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা ও আদর্শের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে সোবিয়েতের সাতসালা পরিকল্পনা এবং যন্ত্রবিদ্যায় তার অগ্রগতি আমাদের কাছে পরম আশ্বাসের বাণী বহন করেই নিয়ে আসছে। আর শুধু আমাদের কাছেই নয়, এই পরিকল্পনা সমগ্র পৃথিবীর অনুন্নত দেশের নিরন্ন বুভুক্ষু নিষ্পেষিত মানুষের কাছেই মুক্তির ইশারা এবং ভরসা জোগাচ্ছে।

সাম্রাজ্যবাদ তাতে প্রমাদ গণছে। তাদের লুণ্ঠনের কাল শেষ হয়ে আসছে। তাই তারা মরিয়া হয়ে প্রচার করছে, সোবিয়েৎ সাহায্য এবং যন্ত্রপাতি স্বাধীন

দেশকে পরাধীন করার অথবা সেখানে কমিউনিজম ছড়ানোর চক্রান্ত, কিংবা মানুষের 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' অপহরণের কৌশল।

দুঃখের বিষয় সমাজবিজ্ঞানী শ্রীবিনয় ঘোষও তাঁর রচনায় সাম্রাজ্যবাদী প্রচারের সুরেই সুর মিলিয়েছেন। আমাদের সমাজ এবং আমাদের বিজ্ঞান উভয়ের পক্ষেই এটা ক্ষতিকর। ভালুকের হাতে খোস্তা তুলে দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনি এ-রকম সমাজবিজ্ঞানীর প্রতি বিশ্বাস ন্যস্ত রাখাও মারাত্মক।

আমি শুধু স্তম্ভিত বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে ভাবছি, শ্রীবিনয় ঘোষ যিনি একদা 'সোবিয়েৎ ও মধ্য এশিয়া' লিখেছিলেন, তাঁর এই হঠাৎ মত পরিবর্তনের পিছনে কী রহস্য এবং কী অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতে পারে? তিনি নিজেই বরিস পাস্তেরনাকের নাম করে এক জায়গায় বলেছেন, 'বর্তমান সমাজে মানুষের সতত দ্বৈত জীবনযাপনের যন্ত্রণার কথা তিনি (পাস্তেরনাক) উল্লেখ করেছেন। এই দ্বিখণ্ডিত সত্তার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের দেহ ও মন দুই-ই তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে।'

এই 'দ্বৈত জীবনযাপনের যন্ত্রণা' কি তিনি নিজেও ভোগ করছেন? এবং 'দ্বিখণ্ডিত সত্তার ঘাত প্রতিঘাতে দেহে ও মনে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছেন?'

এতদিনে তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে বোধ হয় 'অখণ্ড সত্তা' ফিরে পেলেন।